গৌড় ভুজঙ্গ কণ্ঠহার

অম্বরীষ রায়

সুধীন্দ্রনাথ-প্রীতিলতা রায় স্মৃতিরক্ষা কমিটি

গৌড়ভুজঙ্গ কণ্ঠহার

অম্বরীষ রাহা

সুধীন্দ্রনাথ-প্রীতিলতা রাহা স্মৃতিরক্ষা কমিটি

পরিবেশক ও প্রাপ্তিস্থান ঃ

ইণ্ডিয়ান বুক মার্ট
১২/১বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট (দ্বিতল)
ক'লকাতা-৭০০০৭৩

সিদ্ধেশ্বরী লাইব্রেরী
১১০ বিধান সরণী
ক'লকাতা—৭০০০০৪

দত্ত বুক স্টল
৮/১ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
ক'লকাতা—৭০০০৭৩

সঞ্জীব প্রকাশনী
১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
ক'লকাতা-৭০০০৭৩

দাম ঃ আঠের টাকা

প্রকাশক ঃ সুখেন্দ্রনাথ রাহা, সভাপতি, সুধীন্দ্রনাথ-প্রীতিলতা রাহা স্মৃতিরক্ষা কমিটি, ৩৮ ওল্ড ক্যালকাটা রোড, গ্রীণ পার্ক, পোঃ তালপুকুর, ব্যারাকপুর, উত্তর চব্বিশ পরগণা। পিন ঃ ৭৪৩১৮১।

'মায়ের স্মৃতিতে'

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ১৩৯৫
অক্টোবর, ১৯৮৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ১৯৮৮

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ :
শান্তনু প্রামাণিক
বৈদর্ভী রাহা

মুদ্রক :
ইউনাইটেড প্রিণ্টার্স
২৮বি/১এ, অবিনাশ ঘোষ লেন,
ক'লকাতা—৭০০০০৬

প্রকাশকের নিবেদন

উনিশ শ' ছিয়াশির উনিশে ফেব্রুয়ারি মারা যান সুধীন্দ্রনাথ রাহা।

উনিশ শ' পঁচাত্তরের পঁচিশে সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ করেন তাঁর সহধর্মিণী প্রীতিলতা রাহা।

যতদিন বেঁচেছিলেন প্রীতিলতা, নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

তাই সুধীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পরেই প্রতিষ্ঠিত হয় সুধীন্দ্রনাথ-প্রীতিলতা রাহা স্মৃতিরক্ষা কমিটি।

সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবন সুস্পষ্টভাবে দু'ভাবে বিভক্ত। প্রথম বাইশ বছর সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন বঙ্গ রঙ্গালয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। বাংলা নাট্য সাহিত্যে তাঁর অবদান অসাধারণ বাইশটি মঞ্চ সফল নাটক।

কিন্তু তাঁর মোট পঁয়ষট্টি বছরের সাহিত্য-জীবনের বাকীটুকু তিনি উৎসর্গ করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের অন্য একটি ধারাকে পুষ্ট করার জন্য।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ভাণ্ডার থেকে মূল্যবান রত্নগুলি তুলে এনে তিনি অনুবাদ, ভাষান্তর, রূপান্তরের মাধ্যমে এক অনন্য-কীর্তি স্থাপন করে গেছেন; বাংলা সাহিত্যে বিশ্ব সাহিত্যের ধারাটিকে প্রবাহিত করতে তিনি জীবনপাত করে গেছেন দু'শতাধিক গ্রন্থের মাধ্যমে—তাই বর্তমান প্রজন্ম তাঁকে অনুবাদক-রূপেই বেশী চেনে।

সুধীন্দ্রনাথের মূল পাঠক বাংলার কিশোর কিশোরীরা। বার্ধক্যে পৌছেও তাই পাঠক সমাজ কিশোর সাহিত্যিক সুধীন্দ্রনাথকে তাঁর রচনার মধ্যে পেতে চান।

সুধীন্দ্রনাথ-প্রীতিলতা রাহা স্মৃতিরক্ষা কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাই দু'বছর দু'জন নাট্যকার ও দু'জন অনুবাদ-সাহিত্যিককে সুধীন্দ্র-প্রীতি স্মৃতি পদক দিয়ে সম্বর্ধনা জানিয়েছে।

কমিটির অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে কিশোর সাহিত্য প্রকাশনা।

স্মৃতিরক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে তাই গৌড়ভুজঙ্গ-কণ্ঠহার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান অম্বরীষ বইটি লিখতে শুরু করেন আমাদের পিতৃদেব সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কিছু দিন আগে। বইটির শেষ তাই তিনি দেখে যেতে পারেননি কিন্তু করে গিয়েছিলেন নামকরণ "গৌড়ভুজঙ্গ কণ্ঠহার"।

অবশ্যই এখানে উল্লেখ্য যে বইটির মূলে আছে একটি বিদেশী কাহিনীসূত্র।

যাঁরা পড়বেন বইটি তাঁদের আনন্দ দিতে পারলেই আমাদের সকলের শ্রম সার্থক হবে।

যাঁদের অকুণ্ঠ সাহায্য না পেলে বইটি প্রকাশিত হতে পারত না তাঁদের নামোল্লেখ করার অর্থ তাঁদের নিঃস্বার্থ সহযোগিতাকে ছোট করা।

সুখেন্দ্রনাথ রাহা
সভাপতি

মহালয়া, ২৩শে
আশ্বিন, ১৩৯৫
১০ই অক্টোবর ১৯৮৮

সুধীন্দ্রনাথ-প্রীতিলতা রাহা স্মৃতিরক্ষা কমিটি

গৌড়ভুজঙ্গ—কণ্ঠহার

এক

গদাম্— !

ঘুষিটা একেবারে সোজাসুজি চোয়াল লক্ষ্য করেই চালিয়ে দিয়েছে জয়ন্ত।

রতন পাকড়াশির নেহাত চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি যে অনিরুদ্ধ জয়ন্তের থেকেও চটপটে। কি ভাবে যে পঞ্চান্ন বছরের অনিরুদ্ধ একহাতে জয়ন্তের ঐ কয়েক পাউণ্ডি ঘুষি ঠেকালেন, আরেকহাতে রতন পাকড়াশিকে একটা আলতো ধাক্কায় সরিয়ে দিলেন—সেটা এক অনিরুদ্ধ বোসই বলতে পারেন।

রতন পাকড়াশি কিন্তু অনিরুদ্ধ বোসের ঐ মৃদু ধাক্কাতেই কাত হয়ে ঢলে পড়ল একটা বেডিংএর উপর—ওদিকে জয়ন্ত তখনও রাগে ফুঁসছে।

অনিরুদ্ধ কেবল বললেন, 'ছিঃ জয়ন্ত !'

জয়ন্তর কাছে অনিরুদ্ধ বোসের ঐ ছোট্ট ছিঃ টুকুই যথেষ্ট ! যেন সাপের মাথায় যাদুর লাঠি ! জয়ন্তও বসে পড়ল একটা বাক্সের উপর।

রতন পাকড়াশি ততক্ষণ ধুলো ঝেড়ে উঠে পড়েছে। চোখ দু'টো জ্বলছে যেন বাঘের মতো—চিবিয়ে চিবিয়ে তারই মধ্যে কথা কটা শোনা গেল, ভঙ্গিটা রতনের চিরকালই এরকম, অন্তত জয়ন্ত তো যতকাল শুনছে—

—'খুব তো ঘুষি চালালেন—এখন আপনাকে যদি ডায়মণ্ড-হারবারে নামাই—দু'টো ঘানি একসঙ্গে ভালোই লাগবে কি বলুন জয়ন্ত বাবু ?'

ঘুষিটা একেবারে সোজাসুজি চোয়াল লক্ষ্য করেই·········পৃষ্ঠা—১

জয়ন্ত আবারও লাফ দিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু অনিরুদ্ধ ইঙ্গিতে তাকে বসিয়ে দিলেন। মুখে তাঁরও একটু বিদ্রূপের হাসি—'তা আপনি পারেন রতন বাবু—কিন্তু নিজের দিকটা ভেবে কাজ করাই তো আপনার স্বভাব, বিশেষ করে যে চাকরি করেন!'

তিনজনেই চুপ। জয়ন্ত গুম—রতনের একটু একটু করে মুখের ভাব পাল্টাচ্ছে। নাঃ পেশাদারি মঞ্চে নামলে একটা কেউকেটা অভিনেতাই হয়তো হয়ে যেত রতন পাকড়াশি। পলাতক আসামী ধরতে এসে গোয়েন্দা যখন চোর হয়ে যায় হয়তো মুখের এবং গলার স্বর তার এভাবেই পাল্টায়। রতনের গলায় যেন মধু ঝরছে—'না—এটা আমার সত্যি অন্যায় হয়ে গেছে জয়ন্ত বাবু! আমি আপনার কাছে কি ভাবে—' অর্ধ-সমাপ্ত কথাটা আর শেষ হল না; তার আগেই অনিরুদ্ধ বললেন—'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' আর জয়ন্তের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে অনিরুদ্ধ বললেন—'কিন্তু জয়ন্ত তুমি এভাবে মাথা গরম করলে কেন?'

রতনই এল সাফাই গাইতে—'ব্যাপারটা জয়ন্ত বাবুর পক্ষে একটু অস্বাভাবিকই বটে—কিন্তু ওঁর উপরও তো ঝক্কি চলছে কয়েকদিন ধরে কম না!'

জয়ন্ত এবার সরাসরি তাকাল। লোকটার মাথায় ধূর্তামিটা একেবারে ঠাসা। 'ওঁর উপর ঝক্কি চলছে কয়েকদিন ধরে কম না!'—তার মানে সব—সব খবরই ও জানে। আর জানে যে তার প্রমাণটা বাঁ হাতের খোলা চেটোর উপরই ঝক্‌মক্ করছে, আর বাকীটা নিশ্চয় ডান মুঠোর মধ্যে। আরেকবার—রক্তটা ছলাক করে উঠতে চাইছে জয়ন্তের। ব্যাটা—চোর!

কিন্তু অনিরুদ্ধ যেন ওর মনটাকে পড়তে পারেন—সবাইকেই কিছুক্ষণের জন্য অন্তত অন্য ভাবে ভাবনার সুযোগ দেবার কারণেই বার করলেন পকেট থেকে বিলেতি চুরুটের বাক্স। দু'জনকে দু'টো দিয়ে নিজেও ধরালেন একটা।

রতন ডান হাতের বস্তুটি বাঁ হাতে নিয়ে জিনিস দু'টোই একসঙ্গে হাত দুটো অঞ্জলির ভঙ্গিতে জয়ন্তের সামনে রাখল। তারপরই বাকী দু'জনকে অবাক করে একটা স্যালুট ঠুকল। স্যালুটের ঠেলায় জয়ন্তের হাসি এসে যাচ্ছিল—কিন্তু প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাবার দাখিল হল যখন কানে এল রতনের গলা 'প্রিন্স জয়ন্তাদিত্য রায়! —সরি! প্রিন্স জয়ন্ত আদিত্য! আপনি আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।'

জয়ন্ত কি পাগল হয়ে যাবে? প্রিন্স!!

নাঃ দেড়মাস ধরে যা চলছে তার ঠেলা সামলাতে জয়ন্ত অর্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে। এইবার সত্যি সত্যি পুরো পাগল হয়ে যাবে। আর পাগল হতে বাকীই বা কি আছে! না হলে কেউ কোনদিন শুনেছে জয়ন্ত মারামারি করেছে! জয়ন্ত ঘুষি মেরেছে একজন চল্লিশোর্ধ বয়সের মানুষকে! কিন্তু সহ্যেরও—বিশেষ করে এইভাবে চমকের পরে চমকের সহ্যশক্তি আর কারোর আছে কিনা জানা নেই—কিন্তু চৌধুরীদের নাটবল্টু চালান দেওয়া অফিসের হিসাবরক্ষক থেকে বেয়ারা পর্যন্ত সব কাজ করা সাড়ে চারশ' টাকা মাইনের দশটা-ছ'টা খাটা সবেধন নীলমণি কর্মচারী জয়ন্তের নেই। জয়ন্ত তাই চোখ বুঝল—বাঙ্কের উপর কাত হয়ে।

দুই

বাপস্! জয়ন্তের মাথাটা যেন চর্কির মতো ঘুরছে। শরীরটা যদি ব্যায়াম করে আর সাঁতার কেটে লোহার মতো না হতো নিঘ্যাৎ ও ভাবতো ওর রক্তের চাপ কমে গেছে—শক্ত অসুখ বিসুখই হয়েছে একটা।

* * *

ক'লকাতা থেকে উত্তর দিকে গেলে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে হুগলীর এক মফস্বলে জয়ন্তের বাবার করা দেড় কামরার একটা ছোট্ট পলেস্তারা

বিহীন আস্তানা আছে—বাড়ি আর তাকে বলা যায় না ; অন্তত জয়ন্তের ক্ষ্যামতায় তাকে বাড়ির মর্যাদায় রূপ দেওয়া সম্ভব হয় নি।

বাবা বসন্তাদিত্য রায় তাঁর প্রাক্ যৌবনেই ত্যাগ করেন হাওড়ায় তাঁর গণ্ডগ্রাম—কোন এককালে যার পাঁচ মাইল দূর দিয়ে নাকি ছোট্ট রেল চলত—তখনকার দিনে লোকে যাকে বলত মার্টিন কোম্পানীর রেল—তা সেও উঠে গেছে কতকাল আগে। তা বসন্তের সেই জগৎপুর গ্রামে নাকি এককালে খুব বোলবোলাও ছিল জয়ন্তদের পূর্বপুরুষদের ; তালুককে তালুক নাকি ছিল তাদের সম্পত্তি। এ সবই জয়ন্ত শুনেছে মা মালতীদেবীর কাছে। তিনিও জীবনে একবারই গেছেন গ্রামের বাড়িতে—বিয়ের পর বসন্তের দাদা অনন্ত আর তাঁর স্ত্রীকে প্রণাম করার জন্য।

বসন্ত যখন ভাগ্য ফেরাতে শহরপানে পাড়ি দিলেন তখন কতই বা বয়স তাঁর। বড়জোর সতের। লেখাপড়ার ব্যাপারে বসন্তের ছোটবেলা থেকেই কেমন একটা গা এড়ানো ভাব। তাই কেলাস সিক্সেই দু'বার আটকে যাবার পর বাড়িই বসে রইলেন বসন্ত ; দাদা অনন্তের হাজার অনুরোধেও আর ইস্কুলের চৌকাঠই মাড়ালেন না তিনি। তারপর একদিন কুলদেবী জগজ্জননীকে স্মরণ করে দাদার নিষেধ সত্ত্বেও পাড়ি দিলেন ক'লকাতার দিকে। তারপর একটা খেলই দেখালেন বলা যায় বসন্ত। হুগলীর এদিকটায় অনেক চটকল তখন রমরমা করে চলছে—তারই একটাতে তিরিশ টাকা মাইনেয় ঢুকে পড়লেন বসন্ত। এরপর মালিকদের নেকনজর আর বসন্তের হাতের খেল—সংসার পাতলেন, বিয়ে করলেন—মাথা গোঁজার একটা ঠাঁইও করে ফেললেন কি ভাবে কে জানে! তবে সেটাকে ভালো করে চেহারাটা আর দিয়ে যেতে পারেননি ভদ্রলোক। তিরিশ পেরোতেই তিনি মায়া কাটালেন স্ত্রী আর সদ্যোজাত ছেলে জয়ন্তের। জয়ন্তের কাছে তাই বাবা এখন ধুলো পড়া আর ঝাপসা হয়ে যাওয়া ঘরের দেওয়ালে

টাঙানো ফটো ছাড়া কিছু না! বসন্তের মৃত্যুর পর মালতীও আর গাঁয়ের বাড়িতে যান নি—যদিও অনেক অনুরোধ করে চিঠি এসেছে ভাসুর অনন্তের কাছ থেকে। ওদিকে ততদিনে অনন্তেরও স্ত্রী দেহ রেখেছেন। অনন্তের আর সন্তানের মুখ দেখা ভাগ্যে জোটেনি—তাই বৃদ্ধেরও তিনকুলে জয়ন্তের মা আর জয়ন্ত ছাড়া কেউ ছিল না।

মালতী নিজে পারেন না একা যেতে; জয়ন্ত বড় হতে অনেক অনুরোধ উপরোধ করেছেন—এই নিয়ে মায়ে পোয়ে মাঝে মাঝে এক কোমর ঝগড়াও হয়ে গেছে দু'-চারবার; কিন্তু জয়ন্ত! হুঁ! তার সময় কোথায়!

মালতীও যে খুব জোর দিয়েছেন—এটা হলফ করে বলা যায় না —কারণ? কারণ একটা আছে, হিন্দুর ঘরের বিধবা তিনি—বসন্তের দেহত্যাগের পর থেকে পতিতপাবনী গঙ্গায় একটা ডুব না দিয়ে তিনি রান্নাও করেন না—মুখে কিছু তো দেনই না। আর জগৎপুরের ত্রিসীমানায় কোন গঙ্গার দেখা নেই! রামঃ, একেবারে যাচ্ছেতাই জায়গা একটা। তাই—মালতী মনে মনে যে খুব একটা জোর পেতেন ভাসুরের ওখানে যেতে তা নয়—তবু বুড়োটা যখন বংশের একমাত্র সন্তানের মুখটা দেখতে চান—কবে আছেন কবে নেই! কিন্তু ঐ যে বলেছি, জয়ন্তের সময়ও নেই—ইচ্ছেটাও নেই।

ইচ্ছে নেই—তার কারণ একটাই। জয়ন্তের এই আঠাশ বছর বয়েস হল—ও দেখেছে মধ্যবিত্ত বাঙালী যাদের অবস্থা এখন পড়ন্ত—যেন চৌদ্দপুরুষ আগে এক একটা রাজত্ব ছিল অনেকেরই এমন ভাব—। তার গপ্পো ফাঁদতে বসলে তাদের আর সময়ের হুঁশও থাকে না—শ্রোতা শুনছে কিনা সেদিকেও খেয়াল থাকে না! মালতীর মুখে তাদেরও ওরকম তালুকের পর তালুক ছিল কোন এককালে—শুনেছে বহুবার। শুনেছে আর ঠাট্টা করে মাকে থামিয়ে দিয়েছে। আর সত্তর বছরের জ্যাঠার সামনে বসলে যে ঐ সব গপ্পোই আরও সাত-কাহন হয়ে উঠবে এ কথা জয়ন্ত হলফ করে বলতে পারে।

তার দায় পড়েছে ঐ সব গপ্পো শুনতে গাঁয়ের বাড়ি যেতে। ফলে—

ফলে জগৎপুরের জ্যাঠার ভিটে—যা কিনা তাদের বহু পুরুষের জন্মস্থান তা দেখার ইচ্ছে, কৌতূহল, বাসনা তার ছিল না—লোভ তো নয়ই।

হ্যাঁ—ঐ শেষের রিপুটাকে জয়ন্ত অস্বাভাবিক ভাবেই দমন করতে পারে। যদিও জানে জ্যাঠার বোধ হয় সব গিয়েও সাড়ে সাত বিঘে বাস্তু জমি এখনও আছে, ভিটেও একটা আছে; আছে মানে এখনও আছে, যদিও জ্যাঠা আর নেই!

আর বুড়োর মৃত্যুর খবরের পর, জয়ন্ত হাজার অনিচ্ছেতেও জগৎপুরে না গিয়ে পারে নি; কেননা অনন্তের এক ডাকের পড়শী হরলাল অনেক খোঁজ করে ওর অফিসে যেদিন হানা দিল সে ঠিক আজ থোক আঠাশ দিন আগে—জয়ন্ত না হলে বৃদ্ধের মুখাগ্নি করবে কে। পুরো চব্বিশ ঘণ্টা মৃতদেহ আগলে বসে আছে গ্রামের মানুষরা। ফলে বাধ্য হয়েই কোম্পানী থেকে তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে বাড়ির দিকে ছুটল জয়ন্ত—সঙ্গী হরলাল। হরলাল নইলে চিনিয়ে নিয়ে যাবে কে ঐ গ্রামে তাকে! মালতী তৈরিই ছিলেন, হরলাল তো আগে বাড়িই গিয়েছিল কি-না! ঐ বাড়ির ঠিকানাটাই পাওয়া গেছে মৃত অনন্তের ছোট্ট একটা বাঁধানো খাতা থেকে! তাই থেকেই—।

জয়ন্ত চলল। সঙ্গে মালতী; পথপ্রদর্শক হরলাল—আর! ভাবলে হাসিও পায়, মায়ের জন্য কষ্টও হয়; সঙ্গে এক ঘড়া গঙ্গাজল। জয়ন্ত ঘোরতর আপত্তি তুলেছিল—কিন্তু হরলালই দায়টা নিল। গঙ্গাজল ও দিকটায় অমিল বলেই—, আর জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ—হিন্দুর ঘরে গঙ্গাজল তো লাগবেই। তাই—চলল এক কলসী গঙ্গাজলও।

জগৎপুর পৌঁছোতে সন্ধ্যে, রাতেই সৎকার হল। সকাল থেকে শুরু হল হবিষ্যি; সে আরেক ঝকমারি। যাইহোক্, কাজকম্ম মিটল—মিটল মানে একেবারে রাজসূয় ব্যাপার! জগৎপুরের গাঁয়ের তাবৎ

লোক জয়ন্তের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ—এভাবে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ আর খাওয়া দাওয়া! —বৃদ্ধেরা ঘাড় নেড়ে বললেন, 'আরে বাবা! হবে না—এ কি যা-তা বংশ। আদিত্য বংশ বলে কথা। কথায় আছে মরা হাতি লাখটাকা—শুনেই এসেছি রাজার বংশ—এখন দেখলে তো বাপু'—বলে তাঁরা গাঁয়ের ছেলে ছোকরাদের দিকে ঘাড় নাড়ান—।

আদিত্য বংশ! জয়ন্তের মাথাটা সেদিনই ঘুরেছিল। খুব বেশী অবশ্যি ঘোরেনি! কেন ঘোরেনি, কি ভাবেই বা এই শ্রাদ্ধে এতবড় একটা কাণ্ড হল—সেটার জন্য আরেকবার সেদিন মনে মনে অনিরুদ্ধ বোসকে প্রণাম করেছিল জয়ন্ত।

* * * *

জয়ন্ত। জয়ন্তাদিত্য রায়। অনেক সময়ে কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন হয়। কিন্তু জয়ন্তাদিত্য রায়—নামটা শুনলে যে চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে—জয়ন্তের চেহারাটা সে রকমই। পাক্কা ছ' ফুট দেড় ইঞ্চি লম্বা। হাড়ে মাংসে জড়ানো পেটানো শরীর। প্রকৃতি তার শরীরে ঢেলে দিয়েছেন পৌরুষের সমস্ত সৌন্দর্য। টকটকে ফর্সা রঙ, খাড়া নাক, তীক্ষ্ণ অথচ আয়ত চোখ, মুখের হাসিটি অনাবিল। সাড়ে চারশ' টাকায় মায়ে পোয়ের সংসারে ভাতেভাত খেয়েও আজকালকার দিনে পনের দিন চালানো কষ্ট—সেটাকেই টেনে জয়ন্তকে একমাস চালাতে হয়। চালাতে হয় না—চলে—চলে মালতীদেবীর চেষ্টায়—কিভাবে তিনি চালান, তিনিই জানেন। জয়ন্ত চেষ্টা করে না জানার—করেই বা করবে কি? তার ক্ষ্যামতা ঐ সাড়ে চারশ'। তাই পোশাক আশাকে তাকে দীন থেকে দীনতর থাকতে হয়, চালচলনেও। নইলে তার চেহারার জলুসই তাকে চিনিয়ে দিত—কোন একটা বিশেষ অভিজাত রক্তের ধারা বইছে তার শিরায়। তা জয়ন্ত সে নিয়ে ভাবেও নি কোনদিন—, সময়ও নেই তার ও সব ভাবার।

চেহারাটা জয়ন্তের আছে, কিন্তু উচ্চাভিলাষটা কোনদিনই নেই। তাই লেখাপড়াটাও নমো নমো করে সেরেছে। বিদ্যের দৌড় বেচারির টায়ে টোয়ে বি.এ। সে ব্যাপারে অবশ্যি জয়ন্ত কৃতজ্ঞ মায়ের কাছে। বাবার মৃত্যুর পর কোম্পানী কিছু থোক টাকা দিয়েছিল মায়ের হাতে। তাই দিয়ে, নিজের গয়না বেচে; আর আশ্চর্য, ন'মাসে ছ'মাসে হলেও মৃত—না দেখা জ্যাঠার কাছ থেকে—পঞ্চাশ, যাট টাকার সাহায্য—না চাইতেই যেটা তিনি পাঠিয়েছেন—তারই জোরে; আর মায়ের ঘ্যানঘ্যানানিতে বাধ্য হয়েই বি.এ টা পর্যন্ত কষ্ট করে জয়ন্ত চালিয়েছে। তাও পাশ করা কতটা হয়ে উঠতো—সেও জানে না। যদিনা ক্লাসের ফার্স্ট হওয়া অভিরূপের ভালোবাসা আর পরীক্ষার হলে অকৃপণ সাহায্য পেত—! অবশ্যি—বি.এ পরীক্ষার বছর ক'লকাতা ইউনিভার্সিটি ইংরেজীতে দশ নম্বর গ্রেস না দিলে তাতেও কুলোত না। ফলে জয়ন্ত পড়াশুনোটার জন্য কৃতজ্ঞ মায়ের কাছে, অভিরূপের কাছে, আর ইউনিভার্সিটির সেই না দেখা অধ্যাপকদের কাছে!

কিন্তু এই বাজারে ও রকম বি.এ পাশ কে না! সুতরাং যা হবার—তাই হয়েছে, কোনরকমে চৌধুরী কোম্পানীর চাকরিটা জুটেছে। সেটাও অবশ্যি মৃত বাবার দৌলতে। তাঁরই এক বন্ধু কোম্পানীর হিসেব পরীক্ষক। মালতী দেবী চিনতেন তাঁকে। একদিন কেঁদে পড়লেন তাঁর কাছে গিয়ে। ভদ্রলোক নেহাতই সহৃদয়। ব্যবস্থাটা করে দিয়েছিলেন—তাই মায়ে পোয়ে দু'টো খেয়ে পরে চলেছে।

তাই বলে ভাবনার কোন কারণ নেই যে আমাদের জয়ন্ত বাবু নেহাত গোবেচারা। চাকরি করে দশটা ছ'টা আর মায়ের কাছে এসে বসে থাকে সুবোধ বালকের মতো।

জয়ন্তের সময় নেই। সময় নেই—বারবারই বলা হচ্ছে—তা বাকী সময়টা জয়ন্ত করে কি তাহলে!

ছ'টায় অফিস থেকে বেরিয়ে নিজের পাড়ায় ফিরতে যে টুকু সময় ! তারপরই আছে জয়ন্তের যত কাজ। জয়ন্তের অঞ্চলটা জুড়ে কল-কারখানা। আর কল-কারখানা মানেই শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন। বাইরে থেকে জয়ন্ত তাদের কয়েকটা ইউনিয়নেরই পাণ্ডা। গরম গরম বক্তৃতাতে জয়ন্তের নাম ডাক আছে। ফলে আজ এ কারখানার সামনে কাল আরেকটার সামনে মিটিং, মিছিল লেগেই আছে জয়ন্তের। মাঝে মাঝে বিপক্ষ দলের সঙ্গে মারামারি ! তাও আছে। কিন্তু ও ব্যাপারে জয়ন্তের মাথা খুবই ঠাণ্ডা। জয়ন্তের উপস্থিতি বহুবারই এ ধরনের মারামারি ঠেকিয়েছে। এ ব্যাপারেও জয়ন্ত একটা সুনাম নিয়েই চলে। কিন্তু তাতে সময় তো যায়ই। আর তারই জন্য কোনদিন মায়ের জেগে থাকতে হয় রাত বারটা পর্যন্ত, কোনদিন বা ভোররাত সাড়ে চারটে পর্যন্ত।

সাড়ে চারটে ! ঐ ভোর রাত সাড়ে চারটে টা আবার জয়ন্তের বাঁধা ব্যাপার। নেহাৎ পুলিশী হামলায় থানায় আটকে না গেলে ! সেটাও হরবকতই ঘটে। কেওড়াতলির থানার ও.সি-র এলাকা এটা। ও. সি সাহেবের এসব ব্যাপারে যেন একটা জাতক্রোধই আছে জয়ন্তের উপর। জয়ন্তদের বাহিনীর দু'-চারজনকে প্রায়ই তিনি হাজতে পোরেন—তাদের বাড়িতে হামলাটা মাঝে মাঝে না করলে তাঁর বোধহয় ভাতই হজম হয় না। জয়ন্তকে তিনি কোনদিন বাগে পাননি গরাদে ঢোকাতে—এটা তাঁর বড্ড আফশোস্। তাই বলে জয়ন্তের বাড়িতে হামলা করাটাতে তো কোন শাস্ত্রে বারণ করেনি—সেটাও তাই তিনি মাঝে মাঝেই করেন। ফলে মালতী দেবীর এ সব গা সওয়া ব্যাপার হয়ে গেছে।

কিন্তু ঐ সাড়ে চারটে ! যা বলছিলাম। নেহাত আটকে না পড়লে ভোর সাড়ে চারটে থেকে—শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, কোন কিছুই জয়ন্তকে আটকাতে পারে না। প্রত্যেকদিন ঐ ভোররাতে একটা খাটো প্যান্ট আর একটা হাতকাটা গেঞ্জি পরে গঙ্গার পাশের রাস্তা ধরে

দৌড়নো তার চাই—ই। দুই দুই চার কিলোমিটার রাস্তা ও দৌড়বেই। কখনও জোরে, কখনও জগিং। তারপর আধঘণ্টা বিশ্রাম। তারপর—! জয়মা পতিতপাবনী। গ্রীষ্মে এপার-ওপার তিনবার, শীতে দু'বার, বর্ষায় একবার।

সব সেরে কি করে যে দশটায় হাজরে দেয় অফিসে ওই জানে।

তা সেদিন! আজ থেকে দেড়মাস আগে এক দিন। এ পারে এসে গামছা দিয়ে গা মুছছে—সকালের রোদটা এসে ওর গায়ের চামড়ায় যেন ঝিলিক মারছে—তখনই—সামনে এসে দাঁড়ালেন পায়জামা পাঞ্জাবী পরা, মুখে চুরুট এক দশাসই ভদ্রলোক। লম্বায় প্রায় জয়ন্তের কাছাকাছি। পরে মেপে দেখেছে জয়ন্ত, ভদ্রলোক পাক্কা ছ' ফুট লম্বা—প্রস্থটাও নেহাত ফ্যালনা নয়—আর একটু হলেই মোটা বলা যেত কিন্তু জয়ন্ত দেখেই বুঝল সেটা ভদ্রলোক হতে দেননি। হাতের কব্জি দেখেই মালুম, ভদ্রলোকও শরীরটাকে যত্ন করেই রেখেছেন। ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত অবাক হল, কোথায় যেন দেখেছে। ওঃ হরি! ভদ্রলোকও তো সকাল বেলা জগিং করেন। দামী সর্টস আর স্পোর্টস গেঞ্জি গায়ে। বেশীদিন দেখছে না—কিন্তু মাসখানেক ধরে কখনও ও ফিরছে—উনি যাচ্ছেন। কখনও ও যাচ্ছে উনি ফিরছেন—এই ভাবে মুখোমুখি হয়েছে বেশ কয়েকবার। শেষের দিকটা দেখা হয়ে গেলে, দু'জনেই একটু ঠোঁটের ডগায় প্রশংসার হাসি হেসেছেন।

তা—ভদ্রলোকই প্রথম কথা বললেন—গলার স্বরটি গম্ভীর কিন্তু মোলায়েম, 'আপনি তো খুব ভালো সাঁতার কাটেন!'

জয়ন্ত এমনিতে খুবই বিনীত। কি আর বলবে উত্তরে? একটু হেসে গা মুছতে লাগল।

ভদ্রলোকই বললেন—'কাটতাম, একসময়ে আমিও এই গঙ্গায় সাঁতার কেটেছি, এখন—'

জয়ন্ত এবার একটু চমকাল! এই গঙ্গায়! তার মানে!

ভদ্রলোক বোধহয় মনের কথা পড়তে পারেন। বললেন, 'অবাক হচ্ছেন! আরে ভাই আমিও তো এখানকারই মানুষ। অনেককাল জন্মভূমি, মায় দেশ ছাড়া! বহুকাল বাদে আবার দেশের আর মেয়ের টানে ফিরে এলাম।'

তাতো বোঝা গেল, তার মানে এই জায়গাতেই এঁর আদি বাস, এবং একটি মেয়েও ওঁর আছে! কিন্তু!

ভদ্রলোকই আবার মুখ খুললেন—'আমার নাম অনিরুদ্ধ বোস! ঐ যে বোসবাড়ি—ও বংশেরই ছেলে আমি। বোস পাড়ায় আমার নিজের একটা ছোট বাড়ি আছে ওটাই ঠিকঠাক করে—'

জয়ন্ত এবার মুখ না খুলে পারল না। গলা দিয়ে স্বর বেরোল যখন, তখন নিজেই বেশ বিস্মিত! কেননা—সহসা কৌতূহল কোন ব্যাপারে ও প্রকাশ করে না। কিন্তু এখন যে ভাবে কথা কটা বেরোল তাতে যে কৌতূহল রয়েছে যথেষ্ট তাতে জয়ন্তও নিশ্চিত—'আপনি! —আপনি অনিরুদ্ধ বোস! মানে বোস পাড়ায় নতুন বাংলো বাড়িটা—'

'আরে বাংলো কোথায়! ওই একটু নতুন ভাবে সাজানো।'

'কিন্তু আপনি তো মিলিটারিতে গিয়েছিলেন—যেন শুনেছিলাম।' ভদ্রলোক হাসলেন। 'শুনেছিলেন? তা ঠিক! আর কিছু শোনেন নি?'

'মানে শুনেছিলাম—আপনি—মানে এখানে রাজেন্দ্র বিদ্যাপীঠে কিছুদিন তো—'

'হ্যাঁ মাষ্টারিও করেছিলাম। কিন্তু ইয়ংম্যান আমার এতো খবর আপনি রাখলেন কিভাবে?'

'আরে আমি তো ঐ ইস্কুল থেকেই পাশ করেছিলাম। পুরনো দিনের মাষ্টারমশাইরা মাঝে মাঝে আপনার কথা বলতেন।'

'আচ্ছা! আচ্ছা!' ভদ্রলোক আবার একটু হাসলেন। 'কিন্তু দেখুন! আমি আমার নামটা বললাম—আপনার নামটা কিন্তু এখনও শুনতে পাইনি!'

জয়ন্ত বেচারা খুবই লজ্জায় পড়ে গেল। এটা তো সত্যিই ভদ্রতার মধ্যেই পড়ে। উনি প্রথমেই নিজের নাম জানিয়ে পরিচয় দিয়ে দিয়েছেন—আর ও কি না! ছি ছি। তাই লজ্জা আর বিনয় মিশিয়ে জয়ন্ত নিজের নামটা বলল।

কিন্তু নামটা বলামাত্রই যেন একটা বিদ্যুৎ চমক!

অনিরুদ্ধ বোসের কণ্ঠেই বিস্ময়, 'তুমি—তুমি কি বসন্তাদিত্য রায়ের ছেলে ?'

জয়ন্তও অবাক। বাবার নামটা এইভাবে এক সদ্য পরিচিত ব্যক্তির মুখে শুনে—তাও কিনা যে নাম জন্মাবধি সে কোন মানুষের মুখে কোন দিন শোনেনি। —

অনিরুদ্ধ বোস কিন্তু তখন ওর পিঠে হাত রেখেছেন—'তুমি বললাম বলে কিছু মনে কর না বাবা! তোমার পিতৃদেব আমার বিশেষ পরিচিত ছিলেন। আর তাছাড়া আমি যদি রাজেন্দ্র ইস্কুলের মাষ্টারিটা নাই ছাড়তাম—তাহলে তো তুমি আমার ছাত্রই হতে—না-কি ?' হেসে তাকালেন অনিরুদ্ধ!

জয়ন্ত একেবারে পায়ের উপর। ঠকাস করে একটা প্রণাম ঠুকেই ফেললে ও। যদিচ, চট করে জয়ন্ত কারোর পায়ে হাত দেয় না। হাতজোড় কবে নমস্কার করেই কাজ সারে বেশীর ভাগ সময়ে। এই নিয়েও মার সঙ্গে ওর মাঝে মাঝেই লাগে ঝগড়া। কিন্তু পারল না এখানে জয়ন্ত প্রণাম না করে। আসলে বাবার নামটা আর ভদ্রলোকের ব্যক্তিত্ব এবং স্নেহের স্বর ওকে দুর্বলই করে ফেলেছে বা!

'না-না একি বলছেন স্যার! আপনি আমার পিতৃতুল্য।' জয়ন্ত আজ কেবলই নিজের কাছে নিজেই সব বিস্ময়কর কথা বলে ফেলছে।

'তাহলে তো বাবা তোমাকে ছাড়া হচ্ছে না। আমার বাড়ি চলে এস, জামাটামা পরে।'

'কিন্তু স্যার এখন তো আমার অফিস আছে।' জয়ন্ত চট করে

অফিস কামাই করতে রাজী নয়। সে অনিরুদ্ধ বোসের সঙ্গে এই চমৎকার আলাপের লোভেও নয়।

'তাহলে সন্ধ্যে বেলা। সন্ধ্যে বেলায় চায়ের নেমন্তন্ন রইল তোমার। আর সন্ধ্যেতে যদি না আস—তবে আমি কিন্তু হানা দেব তোমার বাড়ি। আর যাই হোক বসন্তাদিত্য রায়ের বাড়ি খুঁজে বার করতে আমার একটুও সময় লাগবে না।'—বলে কৌতুকের হাসি হেসে উঠলেন বোস সাহেব।

জয়ন্ত রাজী হল। ভাগ্যিস জোরদার কোন মিটিং মিছিল আজ নেই।

'তাহলে ঐ কথাই রইল'—বলে আরেকবার জয়ন্তের পিঠে স্নেহের পরশ বুলিয়ে সাবলীল ভঙ্গিতে হাঁটা দিয়েছিলেন সেদিন অনিরুদ্ধ বোস। আর জয়ন্ত! কিছুক্ষণ বিস্ময়ের সঙ্গে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে থেকে, ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে চলতে চলতে ভাবতে থাকল—বাবাঃ বোসবাড়ির সেই অনিরুদ্ধ বোস! এক সময়ে বোস, দেব, আর মিত্রদের জমিদারিতে ভাগাভাগি করেই তো ছিল পুরো অঞ্চলটা। এখন অবশ্য সবাই শরিকে শরিকে টুকরো টুকরো। কিন্তু ও যতদূর জানে তিন বংশের মধ্যে উজ্জ্বলতম রত্ন অনিরুদ্ধ বোস! উড়ো উড়ো ভাবে ও যা শুনেছে তাতে ভদ্রলোক এই ছোট্ট শহরতলীর বাংলো বাড়ির মধ্যে আটকা থাকার মানুষ তো নয়। আবার ভাবল—হতেও পারে, বয়েস হচ্ছে, জন্মভূমির টানে হয়তো বা ফিরেই এসেছেন সত্যি করে।

কিন্তু সত্যিই কি তাই! জয়ন্ত তো ভবিষ্যৎ পড়তে পারে না। তাহলে সেদিনই ও বুঝতো একটা প্রবল আলোড়ন আসছে—যার কেন্দ্র-বিন্দুতে জয়ন্তাদিত্য রায়—ওরফে জয়ন্ত আদিত্য।

তিন

গঙ্গার এই পশ্চিমতীরের নবনগর এখন ছোটখাটো একটা ক'লকাতাই। কিন্তু এক সময়ে তো তা ছিল না। আশপাশ জুড়ে

ছিল পুরাতনী গ্রাম, তারই মধ্যে অবশ্য নবনগর একটু উন্নতই ছিল। কারণটা ঐ—বোস বংশ, দেব বংশ আর মিত্র বংশের দৌলতে। মাইলের পর মাইল জুড়ে তখন তাঁদের ছিল জমিদারি। আর আশ্চর্য! কোন রেষারেষি ছিল না জমিদারি নিয়ে এই তিন পরিবারে; বরঞ্চ একটা মিত্রতার, ক্ষেত্র বিশেষে আত্মীয়তারই সম্পর্ক ছিল নিজেদের মধ্যে। তারই ফলে নবনগরের উন্নতিটা হয়েছিল সে দু'শ' বছর আগেই। কিন্তু চিরকাল এক রকম যায় না। বংশ বাড়তে শুরু করল; শরিক বাড়তে থাকল। সম্পত্তির ভাগও কমতে থাকল সেই অনুপাতে। শেষকালে এমন অবস্থা হয় প্রায়, যে নামেই তালপুকুর—ঘটিও ডোবে না।

এদের মধ্যে বোস বংশের স্থমিত বোস কিন্তু বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ভাগে ভাগে শরিকরা যখন পুরনো দিনের জমিদারির প্রথায় আলস্যে দিন কাটাচ্ছেন, স্থমিত বোস তখন ব্যবসায়ে নেমে পড়লেন। ঝরিয়া ধানবাদে দু'টো কোলিয়ারির, ঘাটশিলায় অভ্রের খনির অংশ কিনে ফেললেন অনেকখানি করে। একটা জাহাজ কোম্পানীরও অংশ কিনে নিজের অবস্থাটাকে পাকা করে ফেললেন ভদ্রলোক। তাতেও ক্ষান্তি ছিল না ভদ্রলোকের, ক'লকাতায় নিজেও একটা আমদানি রপ্তানির ব্যবসা শুরু করলেন। তখন বাংলাদেশ ভাগ হয়নি—পাট উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারত তখন অদ্বিতীয়—চটকলগুলো চলছে রমরম করে; আর সেই চটকল থেকে তৈরি হওয়া নানান্ জিনিস রপ্তানি করে ভদ্রলোক পয়সা জমালেন অনেক।

স্থমিত বোসের বংশে বাতি দিতে এই একমাত্র অনিরুদ্ধ। ছোটবেলা থেকেই অনিরুদ্ধের মেধা স্থমিতকে আশান্বিত করেছিল। তিনি নবনগরে ছেলেকে না পড়িয়ে কলকাতায় হোস্টেলে রেখে হিন্দু স্কুলে পড়াতে পাঠালেন তাকে।

তা স্থমিতের সত্যি দূরদৃষ্টি ছিল। অনিরুদ্ধ ম্যাট্রিকে একটা হৈ হৈ

করা রেজাল্ট করে ফেলেছিল—একেবারে ফার্স্ট। তারপর প্রেসিডেন্সি—তারপর ক'লকাতা ইউনিভার্সিটি। পিছনে কখনও পড়েননি অনিরুদ্ধ। প্রথম হতে হতেই এম. এ টা পাশ করলেন। বাবা সুমিত চাইলেন আরো পড়ুক, গবেষণা করুক—একটানা। অনিরুদ্ধের তখন চব্বিশ ছুঁই ছুঁই। অনিরুদ্ধ এসে বসলেন নবনগরের বাড়িতে। সুমিত ঐ একটা কাজ কিন্তু করেছিলেন। ক'লকাতায় ব্যবসা করলেও—বাড়ি করেন নি। বরঞ্চ পুরনো বাড়িটাকে সাজিয়েছিলেন নতুন করে। অনিরুদ্ধ এসে তার ঘরটা যখন দখল করে বসলেন, তখন সুমিত অবাকই হয়েছিলেন বেশ! অনিরুদ্ধ বাবাকে শ্রদ্ধা করেন যথেষ্টই। কিন্তু ইতিহাসের ছাত্র অনিরুদ্ধ যখন গম্ভীর স্বরে বলে বসলেন, 'ভাবছি আপাতত এই রাজেন্দ্র বিদ্যাপীঠে একটা মাষ্টারি করব আর তারই ফাঁকে ফাঁকে গবেষণা চালাব',—তখন ঘোরতর আপত্তিই তুলেছিলেন সুমিত। মনের মধ্যে বুঝি বা একটু দুঃখই পেয়েছিলেন—সুমিত—যে ছেলে কিনা কোনদিন মুখের উপর কথাটি বলেনি সে আজ তাঁর প্রস্তাবে আপত্তি করছে! সুমিত ভেবেছিলেন ছেলের বুঝি বা হাত খরচার পয়সার অভাব। প্রশ্নটা করেও ফেলেছিলেন তিনি। 'ক' পয়সাই বা দেবে তোমাকে ঐ মাষ্টারিতে? সে পয়সায়'—কথাটা শেষ হতে দেননি সেদিনকার তরুণ অনিরুদ্ধ। যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গেই বলেছিলেন 'পয়সার জন্য সুমিত বোসের ছেলে মাষ্টারি করছে এ'টা আপনি ভাবলেন কি করে বাবা। তা নয়। এতদিন তো পড়লাম। সেই ইতিহাসের বিদ্যেটা যদি দু'চার বছর এখানকার ছেলেদের দিতে পারি—সবাই তো আর সত্যিকারের শিক্ষকের সাহায্য পাওয়ার সৌভাগ্য নিয়ে সুমিত বোসের ছেলে হয় না। আর আপনি ভাবছেন কেন? গবেষণাটাতো এভাবেও করা যাবে।'

সুমিত একটু ক্ষীণ আপত্তি তবু তুলেছিলেন। 'সময়টা তো অনেকটা এদিকে ব্যয় হয়ে যাবে, তাতে তো গবেষণার দিকটায় তুমি অনেক পিছিয়ে পড়বে।'

'এতদিন যখন আপনার বিশ্বাস এবং আশা অক্ষুণ্ণ রেখেছি, আরেক বার দেখুনই না বিশ্বাস করে'—বলেছিলেন সেদিনের অনিরুদ্ধ।

যুবক পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে পিতা সুমিত আবিষ্কার করে-ছিলেন এক আত্মবিশ্বাসে ও ব্যক্তিত্বে পূর্ণ মানুষকে। ছেলের উপর তাঁর স্নেহটা একটা নতুন ধারায় প্রবাহিত হল, বুঝিবা একটু শ্রদ্ধার ভাব তাতে মিশে গিয়েছিল। তাই আর আপত্তি করেননি তিনি।

অনিরুদ্ধ বাবাকে হাতে হাতে প্রায় প্রমাণ করে দিয়েছিলেন তাঁর প্রতিভা ও মেধা। রাজেন্দ্র বিদ্যাপীঠের সর্বজনশ্রদ্ধেয় আজীবন ব্রহ্মচারী, প্রায় সন্ন্যাসী প্রধান শিক্ষক বৃদ্ধ সূর্যবাবু ঘনঘন আসতে লাগলেন সুমিতের বাড়িতে। একটাই কথা তাঁর মুখে—'মেধাবী ছাত্রাবস্থায় তাকে পাইনি বলে বড় দুঃখ ছিল সুমিতবাবু, কিন্তু সব দুঃখ আমার চলে গেছে। এ'রকম অসাধারণ শিক্ষকও আমি আমার এতটা বয়েসে দেখিনি। যেমন জ্ঞান তেমনি পড়ানোর বিশেষত্ব।'

সুমিত আনন্দ পেতেন। আনন্দটা বাড়ত তখন আরও যখন কানে আসত আশ-পাশের ছাত্রদের মুখে অনিরুদ্ধ-মাষ্টারমশাই-এর প্রশংসা।

কিন্তু সত্যিকারের গৌরব অনুভব করলেন তিনি যেদিন এম. এ. পাশ করার ঠিক তিন বছরের মাথায় অনিরুদ্ধের ডক্টরেট করে ফেলার খবরটা এসে পৌঁছোল।

এত আনন্দ তিনি রাখবেন কোথায়!

অনেক সময় অত্যধিক আনন্দও বুঝিবা মানুষকে অসুস্থ করে ফেলে। ছেলের সাফল্যে আনন্দিত বাবা সুমিত একটা ভোজ দেবার কথা ভাবছিলেন—আলোচনা করছিলেন একান্তে স্ত্রীর সঙ্গে। কথা বলতে বলতেই বুকে একটা ব্যথা অনুভব করলেন সুমিত। চব্বিশ ঘণ্টাও সময় দিলেন না তিনি নবনগর আর ক'লকাতার চিকিৎসকদের। চলে গেলেন তিনি। স্থানীয় লোকজনরা খেল—তবে সেটা অনিরুদ্ধের পাশ করার আনন্দের খাবার নয়, অনিরুদ্ধের করা পিতৃশ্রাদ্ধের।

হঠাৎই চলে গেলেন বাবা! সাতাশ বছরের অনিরুদ্ধকে তাই

বুঝে নিতে হল বাবার ব্যবসা-সম্পত্তি। কেটে গেল আরও ছ'মাস। এদিকে মা সুনয়নী দেবী স্বামীর শোকটা যেন কিছুতেই সামলাতে পারছিলেন না। ঠিক ন'মাসের মাথায় তিনিও বুঝিবা সুমিতের সঙ্গে আবার মিলিত হতে পাড়ি দিলেন অন্য কোথা—অন্য কোনখানে!

হতভাগ্য অনিরুদ্ধ। বাবা গেলেন—পিছু পিছু মা। সংসারে আর কেউ রইল না। মনটা বিবাগী হয়ে গেল।

আর এই সময়েই তাঁর মাষ্টারমশাই, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অধ্যাপকের কাছে অনিরুদ্ধ গবেষণা করেছিলেন, তাঁকে একদিন ডেকে পাঠালেন।

সময়টা তখনও ইংরেজ আমল। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অধ্যাপক তাঁকে ডেকে পাঠালেন তিনি ইংরেজ। জাতে ইংরেজ হলেও ভারত শাসন করার যন্ত্রের অংশ তিনি নন, বরঞ্চ ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা ও ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর ভক্তি অসীম। তা সেই প্রফেসার নেভিল সাহেব তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন—'একটা চাকরি করবে?'

'চাকরি?—কিসের, কোথায়?'

'চাকরিটা বাবা মিলিটারিতেই—তবে যুদ্ধে গিয়ে বন্দুক ছুঁড়তে তোমায় হবে না।' হেসে বলেছিলেন ডঃ নেভিল।

'সেটা বুঝেছি, কেননা তাহলে আপনি আমায় ডাকতেন না স্যার। কিন্তু মিলিটারি?'

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে। মিত্র শক্তিতে ইংরেজ, আমেরিকা মায় রাশিয়াও রয়েছে। লড়াই চলছে জার্মানী-ইটালির সঙ্গে। ভারত নেহাত ইংরেজের শাসনে তাই বহু ভারতীয়কে ইচ্ছে-অনিচ্ছেতেও জড়িয়ে পড়তে হয়েছে, সৈন্যবাহিনীতে নাম দিতে হয়েছে। তা সেই যুদ্ধে? অনিরুদ্ধ বোসের মতো ইতিহাসের একজন গবেষক—সেখানে গিয়ে কি করবেন—বিশেষ করে প্রফেসার নেভিল যখন বলছেন যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁকে যেতে হবেই না।

নেভিল খোলসা করলেন ব্যাপারটা। যুদ্ধ মানেই যে স্থলে জলে অন্তরীক্ষে গোলাগুলি ছোঁড়া কেবল তাতো নয়, যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে

আছেন অনেক বিজ্ঞানীরা, ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি—কূট-নীতিজ্ঞরা। অনিরুদ্ধ বোস গবেষণা করে নাম করেছেন। ইংরেজ শাসক তাঁকে অবশ্য প্রথম চায়নি—চেয়েছিল প্রফেসার নেভিলকেই—তাদের কতকগুলি কূটনীতিক গবেষণায় ঐতিহাসিক বিশেষজ্ঞ রূপে ; কিন্তু বয়সটা কম হয়নিতো নেভিলের ! তাই তিনি অনিরুদ্ধকে বলছেন চাকরিটা নিতে, তাঁর কথা তিনি জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষকে। তারা রাজী —এখন অনিরুদ্ধ কি বলেন ? চাকরিটা নিলে সরাসরি একেবারে লণ্ডনে যেতে হবে তাঁকে—কাজটা ঐখানেই কিনা। তবে হ্যাঁ—একটা ছোট্ট প্রশিক্ষণ—মানে প্রয়োজনে আত্মরক্ষার জন্যই—আর কি—নিতে হবে তাঁকে। বন্দুক চালানোটা তাঁকে শিখে নিতে হবে। সব ব্যবস্থাই কর্তৃপক্ষের। মাইনেটাও লোভনীয়।

অনিরুদ্ধ এক সপ্তাহ সময় নিলেন ভাববার। তারপর—একদিকে এই বিজন বাড়িতে সদ্য প্রয়াত বাবা-মার স্মৃতির তাড়না, আর একদিকে নতুন একটা অভিজ্ঞতার হাতছানি। বিশেষ করে মানুষ যখন মারতে হচ্ছে না তাঁকে। 'যাই তো চলে তারপর দেখাই যাক না। খারাপ কিছু হলে নেভিল সাহেব আর যাইহোক তাঁকে অনুরোধ অন্তত করতেন না—এ বিশ্বাস তাঁর আছে।'

অনিরুদ্ধ সময় চাইলেন তিনমাসের। এদিককার বিলি ব্যবস্থা তো একটা করতে হবে !

বাবার ব্যবসা-সম্পত্তি যা ছিল সব বেচে দিলেন অনিরুদ্ধ। কয়েক লক্ষ টাকা। সমস্তটা সরকারী ব্যাঙ্কে জমা করে দিলেন নিজের নামে। তারপর একদিন ডঃ অনিরুদ্ধ বোস বিদায় নিলেন নবনগর থেকে। একেবারে লণ্ডন।

বিদায় নেবার বিশেষ কেউ ছিল না নবনগরে পরিচিতদের মধ্যে। রাজেন্দ্র বিদ্যাপীঠের প্রধান ও অন্য সহশিক্ষকরা, দু'-এক জন আত্মীয় স্বজন। শিক্ষকরা দুঃখই পেলেন অনিরুদ্ধের সাহচর্য হারাতে হবে এই জন্য ; তার থেকেও কষ্ট পেল ছাত্ররা। আর একজন যুদ্ধের নাম শুনে

—আতঙ্কিত হয়ে হাত ধরে বারণই করেছিলেন—তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে অসুবিধে হয়েছিল তাঁর।

এই ব্যক্তিটিই হলেন বসন্তাদিত্য রায়। বসন্তের সঙ্গে এমন কি গভীর সম্পর্ক অনিরুদ্ধের! চটকলের সামান্য কেরাণী—কেলাস সিক্স পর্যন্ত পড়া বসন্তের সঙ্গে লক্ষপতি-বিদ্বান অনিরুদ্ধের কি এমন ভালবাসা!

সে এক মজার ব্যাপার।

এক সন্ধ্যের অন্ধকারে—ইস্কুলের থেকে সাইকেল চড়ে ফিরছেন অনিরুদ্ধ রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁষেই—রাস্তার ডান দিক দিয়ে উল্টোমুখে আসছেন বসন্ত—ফিরছেন চটকল থেকে। গন্তব্য যে যাঁর বাড়ি। তা হল কি—দু'জনে যখন রাস্তার ঠিক এপারে আর ওপারে, বসন্ত রাস্তার এদিক-ওদিক তাকিয়েই সাইকেলটাকে দ্রুত ঘোরালেন অনিরুদ্ধের দিকে। আসলে অনিরুদ্ধ যেখানে তখন—তার পাশের গলিটাতেই বসন্তের বাড়ি। তাই—। কিন্তু বড় রাস্তাটার নাম গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। এ রাস্তায় লরি-ট্রাক চলে ঝড়ের গতিতে। সাবধান হওয়া সত্ত্বেও বসন্ত খেয়াল করেননি একটা লরি ঝড়ের গতিতে আসছে। খেয়াল যখন হল তখন দেখা গেল অনিরুদ্ধ আর বসন্ত দু'জনেই মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছেন, সাইকেল দু'টো অক্ষত অবস্থায় চাকা ঘুরিয়ে চলেছে মনের আনন্দে; আর পাশে লরির চাকার ধুলোর ঝড়। খুবজোর বেঁচে গেছেন বসন্ত। কিন্তু এখন?

বসন্ত ঐ অবস্থাতেই ক্ষমা চাইতে থাকলেন। অনিরুদ্ধ যত না—না—করেন, বসন্তের বিনয় ততো বাড়ে। একসময়ে যাহোক শেষ হল ক্ষমা চাওয়ার। তারপর দেখা গেল দু'জনেই প্রাণেতো বেঁচেইছেন, খুব একটা লাগেও নি। অনিরুদ্ধের বাঁ হাতের কব্জিতে একটু চোট—বসন্তের পায়ে। সামনে ছিলেন কালী ডাক্তার তাঁর দাওয়াখানায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর দু'জনেই সাইকেলে

চড়তে যাবেন—বসন্ত ধরে পড়লেন অনিরুদ্ধকে—তাঁর বাড়ি এক পা গেলেই—এক-কাপ চা গরীবের বাসায়—।

বসন্তের বিনয় আর অনুরোধ এড়াতে পারলেন না অনিরুদ্ধ। গেলেন বসন্তের বাড়ি। তারপর থেকেই যাতায়াতটা বেড়ে গেল বেশ। বসন্ত তখন সবে বিয়ে করেছেন, ফলে চা-টা চলে ঘন ঘন—আর চলে ধূমপান। অনিরুদ্ধের ঐ কু-অভ্যেসটি ছিল ছাত্রাবস্থার শেষ দিক থেকেই। কিন্তু নবনগরে বেচারী না পারেন বাড়িতে একটু সিগারেট খেতে—না পারেন বয়ঃজ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের জন্য ইস্কুলে। না পারেন এমন কি পথেঘাটে যখন তখনও। চারপাশেই তো বাবার বন্ধু-বান্ধব। সমবয়সী আত্মীয়দের সঙ্গে অনিরুদ্ধের খুব মাখামাখি নেই। তারা এখনও সেই জমিদারি কায়দায় বাবুয়ানা নিয়েই আছে। অনিরুদ্ধ এজন্য একটু এড়িয়েই চলেন তাদের। তাই বসন্ত তাঁকে আকৃষ্ট করলেন। কিন্তু কেবল চা-সিগারেট কতক্ষণ পারত ছু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখতে! ছু'-চারদিনের মধ্যেই দেখা গেল ছু'জনের আরও একটি নেশা আছে, সেটি দাবা।

ব্যস—আর পায় কে। দাবা—চা—সিগারেট, প্রতিদিন সন্ধ্যে ছ'টা থেকে ন'টা পর্যন্ত কোথা দিয়ে কেটে যেত ছু'জনের। মাঝে মাঝে ছু'চারটে ছুটির দিন তো প্রায় সারাদিনই।......

জয়ন্ত অবাক হয়ে শুনছিল অনিরুদ্ধ বোসের গল্প। সামনে তখন কফির কাপ। সন্ধ্যে বেলার চা খাওয়া মানে যে এতরকম আয়োজন, যার মধ্যে মালতী দেবীর মতে নিষিদ্ধ খাবারও ছিল একগাদা, জয়ন্তের এই সাড়ে চারশ' টাকা মাইনের জীবনে কোনদিন অভিজ্ঞতা হয় নি। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে জয়ন্ত যে একেবারে মায়ের শাস্তর মেনে চলে তা নয়—মিটিং মিছিল করতে গিয়ে অনেক সময়েই বন্ধু বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে ছু' চারদিন এমন খাবারও সামান্য খেয়েছে সে, যা শুনলে মালতীদেবী কবেই বা গঙ্গায় ডুব দিতে গিয়ে আর উঠতেনই না। যদিচ জয়ন্ত পুরনো আর্য সভ্যতার উদাহরণও দিতে পারত প্রয়োজনে!

ভরপেট খাওয়াই হয়ে গিয়েছিল জয়ন্তের। তৃতীয়বার কফির কাপটা আসতে ও প্রায় বারণই করতে যাচ্ছিল, সেই সময়ে হঠাৎই একটা প্রশ্ন করলেন অনিরুদ্ধ যার ফলে কফির কাপটা আপনা থেকেই জয়ন্তের হাতে উঠে এল।

'আচ্ছা জয়ন্ত! একটা কথা বলতে পার?'

'বলুন স্যার?' জয়ন্তের উত্তর।

''রায়' পদবীটা কোন ক্ষেত্রেই আসল পদবী নয়—এটা বোধ হয় জান।'

'হ্যাঁ সে রকমই তো শুনেছি।'

একটা দামী চুরুট ধরালেন অনিরুদ্ধ। জয়ন্ত মনে মনে হিসেব করল, এটা পঞ্চম। অন্তত জয়ন্তের সামনে তো বটেই। ধূমপানটা ভদ্রলোকের কাছে নেশা এবং বিলাসিতা। প্রথম দফাতেই অবশ্য—অনিরুদ্ধ জয়ন্তকেও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ঐ দামী চুরুট একটা। জয়ন্ত ধূমপান করে—ভালোই করে। ওর খরচায় যেটা কুলোয়—একেবারে দেশী বিড়ি। এই চুরুট সে সারাজীবনেও খায়নি। তা ছাড়া যে পরিচয় অনিরুদ্ধের ও পাচ্ছে—তাতে এমন অভব্যতা জয়ন্তের পক্ষে সম্ভব নয়—যে অনিরুদ্ধের সামনে বসে সে চুরুট ফুঁকবে।

জয়ন্তের বিনীত প্রত্যাখ্যানের পর সেদিন আর অনিরুদ্ধ দ্বিতীয় বার ওকে অনুরোধ করেননি।

পঞ্চম চুরুটে এটা সুখটান দিয়ে অনিরুদ্ধ নিজের সোফায় গা' টা এলিয়ে দিয়ে করলেন দ্বিতীয় প্রশ্নটা—

'তা, তোমাদের আসল পদবী কি ছিল জান সেটা?'

—এবার মাথা চুলকানোর পালা জয়ন্তের। এ চিন্তাটা তার মাথাতে আসেওনি কোনদিন, আর প্রশ্নটা করবেই বা কাকে? মা কে? রামঃ—তাহলেই তো সেই তালুক মুলুকের কথা এসে পড়বে। আর মা'ই কি জানেন? কেননা ক' পুরুষ ধরে ওরা 'রায়' পদবী ব্যবহার করছে তাই বা কে জানে?

অনিরুদ্ধ বুঝলেন জয়ন্তের অবস্থাটা। তাই বললেন, 'বৌঠান জানেন?'

জয়ন্ত বুঝল—মালতীর কথাই বলছেন অনিরুদ্ধ। এককালে বসন্তের সঙ্গে যখন এতটাই মাখামাখি ছিল নিশ্চয় বৌদি বা বৌঠান বলে একটা সম্পর্ক অনিরুদ্ধ পাতিয়েছিলেন।

'তা তো—বলতে পারছি না স্যার—তবে মনে হয়—'

অনিরুদ্ধ বললেন, 'যাক ও নিয়ে আর তোমাকে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে না। কালকে যখন তোমার বাড়িতে গিয়ে চা খাব—'

জয়ন্ত প্রায় মুচ্ছো যায় আর কি! 'স্যার। আমার বাড়িতে—মানে—চা হয়তো এক কাপ দিতে পারব—কিন্তু আমার অবস্থা তো শুনলেন—।'

অনিরুদ্ধ প্রায় একটা কঠিন ধমকই দিলেন জয়ন্তকে। 'এ ধরনের কথায় যে হীনমন্যতা প্রকাশ প্রায় সেটা আর যারই শোভা পাক তোমার পায় না।' বলে ধমকটা একটু জোরই হয়ে গেছে বুঝে—মনে মনে একটু লজ্জাই পেলেন অনিরুদ্ধ।

'যাব আমার বৌঠানের সঙ্গে দেখা করতে, কতকালের পরিচয়! সেখানে জল খাব কি চিড়ে ভাজা দিয়ে চা খাব—তাতে তোমার কি হে—আদিত্য সাহেব।'

চিড়ে ভাজা! হ্যাঁ মালতী দেবী ছুটিছাটার দিনে ছেলেকে চিড়ে ভাজা খাওয়ান বটে—এবং সেটা যে খুবই সুস্বাদু সেটা জয়ন্ত মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করে মায়ের সামনেই। তার মানে তিরিশ বছর আগেও ওটা মালতী দেবী অনিরুদ্ধকে খাইয়েছেন। আর এই অসামান্য ভদ্রলোক সেটি মনে রেখেছেন। শ্রদ্ধা আর এক প্রস্থ না বেড়ে পারে কি!

কিন্তু জয়ন্ত তবু হেসে ফেলল।

অনিরুদ্ধ তাকালেন। চোখে একটা তাঁরও হাসির ঝিলিক। 'কি?—কি রকম হাঁড়ির খবর রাখি দেখেছ?' ভাবখানা এই।

কিন্তু জয়ন্ত হেসেছে অন্য কারণে। তার হাসির কারণ ঐ

'আদিত্য সাহেব' সম্বোধনে। পরিচিতজনেরা ডাকে 'জয়ন্ত' বলে, মা ডাকেন 'খোকা' বলে, বন্ধুবান্ধবদের কেউ কেউ খেপাবার জন্য কখনও কখনও 'জন্তু'ও বলে। হ্যাঁ! 'আদিত্য' বলত অভিরূপ। তা সেও এখন আমেরিকায়। তার মানে কি বিদেশ ঘোরা পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছে 'আদিত্য' নামটাই পছন্দ—হাসিটা আবারও এসে যাচ্ছে। কিন্তু তখনই অভিরূপের একটা ছোট্ট কথা তার মনে এল—উড়িয়েও দিল অবশ্য তখনই মনে মনে। অভিরূপ বলত, 'বুঝলি তোর এই আদিত্য নামে একটা বেশ আগেকার জমিদার জমিদার ভাব আছে—যাকে বলে রাজকীয় ভঙ্গিমা! চেহারাটাও তো করেছিস সেরকম।' হ্যাঁ বলত বটে অভিরূপ।

এবার অনিরুদ্ধ বোসেরও সে রকম একটা ধারণা হয়ে বসলেই গেছে ও। তাহলে আর এ পথ মাড়ানো নয়!

অনিরুদ্ধ কিন্তু থামেন নি। ঠাট্টাটা চালিয়েই যাচ্ছেন—'তা আদিত্য সাহেবের যদি নেহাত আপত্তি থাকে—তবে'

জয়ন্ত হাঁ—হাঁ করে উঠল। 'এ কি কথা বলছেন, স্যার! আপনি যাবেন আমার বাড়িতে—আমার জন্ম হবার আগে থেকেই তো সে অধিকার আপনার স্বোপার্জিত।'

'বলেছ মন্দ নয়। তা আরেকবার কফি হোক।'

'আর নয়—এবার উঠি।'

'কেন কোথাও বক্তৃতা দিতে হবে নাকি?'

ওঃ! ভদ্রলোক সব খবরই রাখেন। জয়ন্তের আর ওঠা হল না।

'বস—বস। তোমাকে আরেকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। তাকেও বলে রেখেছি। তা সে—পাত্তাই নেই তার।—হাত দু'টো নিরুপায় ভঙ্গিতে উল্টে দিলেন ভদ্রলোক।

জয়ন্ত একটু সাহস পেয়েছে এতক্ষণে। বলল—'তা হলে এক-কাপ চা বলুন।'

'বেশ তাই হোক।' বলে অনিরুদ্ধ চায়ের কথাই বললেন চাকরকে।

'লণ্ডনে আপনি কতদিন ছিলেন, স্যার?' জয়ন্তের কৌতূহলটা বাড়ছে।

'বাকী জীবনটার কেন্দ্রবিন্দু ছিল লণ্ডনই। কিন্তু একটানাতো সেখানে ছিলাম না। মিলিটারির কাজ শেষ হয়ে গেল দু'বছরের মাথাতেই। তা ঐ কাজটা করার সময়েই'—একটু যেন থেমে গেলেন অনিরুদ্ধ, 'আমাকে যাতায়াত করতে হত লণ্ডন মিউজিয়ামে—ওখানকার প্রাচ্যদেশীয় বিষয়গুলি নিয়েই আমার কাজ ছিল।' আবার একটু চুপ করলেন অনিরুদ্ধ: 'ওই সব কাজ করার সময়েই আমি এমন একটা রহস্যময় ঘটনার ইঙ্গিত পাই যে মিলিটারির কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তাই লণ্ডনেই রয়ে গেলাম। একটা চাকরিও পেলাম ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য ইতিহাস পড়ানোর। চাকরিটা আমার অবশ্য মূল উদ্দেশ্য ছিল না—'

'তবে?' প্রশ্নটা জয়ন্তেরই।

'উদ্দেশ্য ছিল সেই রহস্যটা সম্পর্কে তাবৎ ইতিহাস সংগ্রহ করা। তাই টানা পাঁচবছর কাজ করলাম। কয়েকটা গবেষণা গ্রন্থও অবশ্য বেরিয়েছিল ঐ সময়ে—'

'ঐ যে বিষয়টা বললেন—তার উপর?' আবার জয়ন্তের কৌতূহল।

'না! সে রহস্যের কিনারা আর করতে পারলাম কই। এরই মধ্যে ইলোরার মা মারা গেলেন।' একটু বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন ভদ্রলোক।

জয়ন্তকেও বিষণ্ণতা স্পর্শ করল। 'ইলোরা! আচ্ছা! ভদ্রলোক বলেছিলেন বটে সকালে গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে—জন্মভূমি আর মেয়ের কথা। তাহলে সেই মেয়েরই নাম ইলোরা।'

বিষণ্ণতাটা অনিরুদ্ধ ততক্ষণ ঝেড়ে ফেলেছেন। 'লণ্ডনে গিয়েই

পরিচিত হই এক প্রবাসী বাঙালীর সঙ্গে। ভদ্রলোক চিকিৎসক—এবং বাঙালী। নাম ছিল ডাঃ শ্যামল সেন। তাঁরই মেয়ে। কিন্তু বিয়ের তিন বছরের মাথায় মারা গেলেন। তখন ইলোরার বয়স এক-বছর হয়নি। দাদু-দিদিমার কাছেই থাকত মেয়েটা। কিন্তু তাঁরাও গত হলেন। আমি ছাড়া ওর আর রইল না কেউ—তখন ওর দশ বছর বয়েস। এদিকে ঐ রহস্যটা আমাকে টানছিল দুর্নিবার ভাবে। একবার ভারতে—একবার!' হঠাৎই ছেদ টেনে দিলেন অনিরুদ্ধ বাক্যটার।

চায়ের কাপ শেষ করে আরেকটা চুরুট ধরালেন অনিরুদ্ধ। আজ তাঁকে কথায় পেয়ে বসেছে। জয়ন্তেরও কৌতূহল বেড়ে চলেছে। এ যেন ঠাকুরমার কোলে বসে রূপকথার গল্প শোনা।

'জানলে হে—তোমাদের ইতিহাসের মাষ্টার আফ্রিকার জঙ্গলেও গিয়েছিল।'

'আফ্রিকার জঙ্গলে!' জয়ন্ত প্রায় অজ্ঞান হয় আর কি?

'যাই নি কোথায়?' মেয়েটাকে দিলাম ওখানকার এক নামকরা ইস্কুলে। লণ্ডনে থাকতে টাকা পয়সা কম রোজগার করিনি। দেশের ব্যাঙ্কের সঙ্গেও যোগাযোগটা ছিল। ওসব ব্যাপারে আমি কিন্তু আদৌ ভুল করিনা।' হা—হা করে হেসে উঠলেন অনিরুদ্ধ। 'সংসার-সুখ আমার কোনদিনই হয়নি জয়ন্ত, কিন্তু টাকা—না চাইতেই অঢেল। তাই—'

'তাই বিশ্বভ্রমণ করে ফেললেন!'

'শুধু কি বিশ্বভ্রমণ। দুর্গম সব জায়গা। এমন কি—' অনিরুদ্ধ এবার নিজেই কথায় ছেদ টানলেন। উঠেও পড়লেন। নাঃ আর তোমাকে আটকে রাখব না। রাত সাড়ে ন'টা হল। আর সেও তো এল না এখনও—কি জানি?' একটু চিন্তিতই মনে হল অনিরুদ্ধকে।

যদিও সাড়ে ন'টা রাত জয়ন্তের কাছে কিছু না। তবু অনিরুদ্ধ বোধহয় আর আজকে টানতে চাইছেন না গল্প। জয়ন্ত উঠে পড়ল।

'হ্যাঁ—বাড়ি গিয়ে মাকে আপনার কথা বলতে হবে। আর কাল সন্ধ্যে বেলায় যাচ্ছেন তো ঠিক !'

'যাব না কি হে ? নিজে থেকে চায়ের নেমন্তন্ন নিলাম—' আরেক দফা হাসি অনিরুদ্ধের।

জয়ন্ত বেরোচ্ছে। বিদায় জানাতেই অনিরুদ্ধও তার সঙ্গে গ্রীল দেওয়া গাড়ি বারান্দাটায় এসে দাঁড়িয়েছেন—অনিরুদ্ধ নিজের হাতে গ্রীলের দরজাটা খুলে দিয়েছেন—জয়ন্ত তিনধাপ সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রেখেছে—একটা ঝড় এসে ঘ্যাচাৎ করে থামল।

একটি মোটর বাইক। প্যান্ট-সার্ট পরে যে নামল—জয়ন্ত তার মুখের দিকে তাকাবে কি ? আগে ভির্মি খাওয়া সামলাবে—তারপর তো !

বাইক থেকে নামল আরোহী নয়—মাথার ব্যাণ্ডটা (চুল আটকে রাখার বিশেষ ফিতে) খুলতে খুলতে কথা বলল যে সে আরোহিণী। চুলগুলো পিছন দিকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে আরোহিণী বলে উঠল 'সরি—বাপী—আমি খুবই দুঃখিত। একটা কাজে এমন আটকে গেলাম। আর আপনিই নিশ্চয় জয়ন্তাদিত্য রায়। আজ আমাকে দয়া করে ক্ষমা করবেন। কাল আপনার সঙ্গে চুটিয়ে গল্প করব। বাবাঃ! বাবার মুখে আজ সারা সকাল আপনার কথা এতো শুনেছি —কিন্তু প্লীজ আজ—'

জয়ন্ত কোনভাবে ঢোক গিলে বলল—'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি আজ খুব ক্লান্ত বোঝাই যাচ্ছে—কালকে বরঞ্চ স্যারের সঙ্গে আমাদের বাড়ি চলে আসবেন।' বলেই প্রায় এক ছুটে জয়ন্ত গেট পেরিয়ে রাস্তায়। এমন কি ভদ্রতার খাতিরে অনিরুদ্ধকে বিদায় সম্ভাষণটা পর্যন্ত জানাতে ভুলে গেল।

বাপস্—এই ইলোরা! এতো—! কোন উপমাই তার মাথায় এল না। মাথায় এল কেবল এইটুকু—মৃত স্বামীর পুরনো বন্ধু

অনিরুদ্ধকে আদর করেই গ্রহণ করবেন মালতী দেবী—কিন্তু প্যান্ট-সার্ট পরা ঐ মেমসাহেব!

জয়ন্ত আঠাশ বছরের পরিচিত পথেও হোঁচট খেল একবার।

চার

না—অভদ্রতাটা জয়ন্তের ইচ্ছাকৃত নয়। সেরাত্রেই এসে মাকে জয়ন্ত অনিরুদ্ধ বোসের খবরটা দিয়েছিল। মালতী দেবী এক দিকে যেমন আনন্দও পেলেন অন্যদিকে তেমনি একটা ভাবনাও দেখা দিল। তিরিশ বছর বাদে অনিরুদ্ধ বোসকে শুধু চিড়ে ভাজা দিয়ে আতিথেয়তা করবেন! জয়ন্তের কাছে প্রশ্নটা তুলেও ছিলেন একবার।

জয়ন্ত এসব ব্যাপারে একটু কঠোরই। বলেছিল—'তা গরীবের বাড়ি মণ্ডা-মিঠাই পাব কোথায়?'

মালতী দেবী চুপ করে গিয়েছিলেন। জয়ন্ত যে কিছু করবে না, সে তিনি ভালোই জানেন। যা করার তাঁকেই করতে হবে!

জয়ন্ত মাকে অনিরুদ্ধের সব কথাই বলেছিল সংক্ষেপে। মালতী সব শুনে জিজ্ঞেসও করেছিলেন একবার—'মেয়ে আছে বলছিলি—তার সঙ্গে আলাপ হল!'

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। এতক্ষণ এ ব্যাপারটা জয়ন্ত এড়িয়েই গিয়েছিল—আগামী কাল কি হবে সেই ভেবেই বলে সে সারা—!

'হল আর কোথায়? আমি যখন চলে আসছি তখন এক ঝলক দেখা।' বলে জয়ন্ত ইচ্ছে করেই একটা বিশাল হাই তুলে ঘুমোতে চলে গেল।

মালতী দেবী এমনিতে সহজ সরল মহিলা। জয়ন্তের কথার মধ্যে কোন ইঙ্গিত তিনি ধরলেন না। ঠাকুর প্রণাম করে তিনিও গুটি গুটি শোয়ার ব্যবস্থা করতে গেলেন।

পরের দিন সকাল জয়ন্তের কাটল যথা নিয়মে। তবে সেদিন পথে বা গঙ্গার ধারে অনিরুদ্ধের সঙ্গে তার আর কোথাও দেখা হয় নি। অফিস যাওয়ার পথে কেবল গজার দোকানে বলে গেল 'ওর ইস্‌পেশাল কাঁচাগোল্লা' যেন পোয়াটাক (বর্তমান ২৫০ গ্রাম)-বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। নবনগরের কাঁচাগোল্লা আর সেটা যদি গজার ইস্‌পেশাল হয়—তাহলেই যথেষ্ট !

সারাটা দিন জয়ন্ত অফিসে কাজ করে আর ভাবে—ঐ প্যাণ্ট পরিহিতা ইলোরা নাম্নী তরুণীটিকে দেখলে মায়ের চিড়ে ভাজা না মাথায় ওঠে ! কি করে ব্যাপারটা সামাল দেবে এই ভাবনাতেই তার সেদিন কাজেই মন বসছে না ! দু' একবার মনের কোণে উঁকি যে না মারল কথাটা তাও নয়—'ডুব দেব—নাই যদি থাকি ও সময়ে !' সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় মনটা বলে ওঠে, 'সেটা অভদ্রতা হবে !' ইলোরা প্যাণ্ট-সার্ট পরলে তার কি করার আছে। মেয়েটার প্যাণ্ট সার্ট পরা নিয়ে ভাবাটা তার একটু বেশীই হচ্ছে—আসলে জয়ন্ত এই ষাটের দশকে দু-একজনকে এ'রকম পোশাকে দেখলেও মালতী দেবীর যেমন শুচিবাই ভাব ! যাকগে আর ভাবা যায় না।—

জয়ন্ত তাই কর্তব্য করার জন্য যথাসময়েই হাওড়া স্টেশনে এল—ও ট্রেনেই যাতায়াত করে—মিনিট কুড়ি লাগে নবনগর স্টেশনে পৌঁছোতে।

কিন্তু বাদ সাধল ট্রেন। মাঝ রাস্তায় তিনি এমন বিগ্‌ড়ান্ বিগড়োলেন যে জয়ন্ত নবনগরে নামল যখন—তখন রাত দশটা।

কি আর করা ! অপরাধী মুখ করে বাড়ি ঢুকল যখন—তখন মালতী দেবী এই মারেন তো সেই মারেন।

'অসভ্যতার একটা সীমা থাকে খোকা। বোস ঠাকুরপো—নিজে থেকে আজ তিরিশ বছর বাদে এ বাড়িতে পা দিলেন, মেয়েটাকে তুই নিজে নেমন্তন্ন করে এলি—আজকের দিনটা কি তোর ঐ ছাইভস্ম মিটিং-এ না গেলেই চলছিল না !'

জয়ন্তেরও মেজাজ গরম। পাক্কা সাড়ে তিনঘণ্টা ট্রেনে দমবন্ধ অবস্থায় আটকে থেকে কি না!

'তা বল গিয়ে তোমার ট্রেন কোম্পানীকে! মাঝ রাস্তায় ট্রেন আটকে রেখেছিলাম কি আমি!'

ট্রেনের গণ্ডগোলের কথা শুনে মালতী দেবী একটু ঠাণ্ডা হলেন। তারপরই একটা রেকাবী করে পাঁচ রকম মিষ্টি নিয়ে বাড়িয়ে দিলেন জয়ন্তের দিকে। তোর বোসকাকু নিয়ে এসেছেন—হাঁড়ি হাঁড়ি মিষ্টি। এখন একটু খেয়ে চা—খা। ভাত হতে আজ একটু দেরীই হবে। এইতো সবে গেলেন ওঁরা।'

জয়ন্ত থালাটার দিকে দেখল। কোন মিষ্টিই নবনগরের চেনা মিষ্টি নয়। তার মানে—! মানে একটাই। ক'লকাতা থেকে আনিয়েছেন বোস সাহেব। পয়সা আছে—ভদ্রতা করেছেন!

'—গজা মিষ্টি পাঠিয়েছিল? জয়ন্ত চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল। মা রান্নাঘরে।

'—হ্যাঁ। তা—সে মিষ্টি'—বলতে বলতে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঢুকলেন মালতী দেবী—'খেতে বয়েই গেছে ওঁর। কোন মিষ্টিই মুখে তুলল না বাপ বেটী—খালি বলে চিড়ে ভাজা—চিড়ে ভাজা। আর চাও খেতে পারেন বটে বোস ঠাকুরপো! এক বাটি করে চিড়ে ভাজা খাচ্ছেন—এক কাপ করে চা—একটা করে—কি বলে গিয়ে তোদের—?'

'চুরুট!'

'হ্যাঁ, ঐ চুরুট!'

'তা তোমার বোস ঠাকুরপো নয় চিড়ে ভাজা খেতে ভালোবাসেন, তার মেয়েও কি তাই'—এ প্রশ্নটা করেই জয়ন্ত আড়চোখে তাকিয়ে নিল একবার মায়ের মুখের দিকে। প্যান্ট পরা ছেলে অনেক দেখেছেন মালতী দেবী, কিন্তু আজকের অভিজ্ঞতার পর মায়ের তো একবার

গঙ্গাচান করা দরকার বোধহয়। কিন্তু ভাবগতিকটা যেন কি রকম কি রকম!

'মেয়ে! সে তো আর এক কাটি উপরে রে! আমি তো ভেবেছিলাম—বোস ঠাকুরপো বিদেশে কোন মেমসাহেব বিয়েটিয়ে করেছিলেন বোধ হয়। ও মাঃ' মালতী দেবীর গোল চোখের দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত আর একটু হলে হেসেই ফেলেছিল; 'দরজায় কড়া নাড়তেই খিল খুলেছি—টিপিস করে পেন্নাম ঠুকল এক মেয়ে—পরনে এই লাল পাড় তসরের শাড়ি, লাল জামা। পিছনে হাতে বার-শিবতলার পুজোর প্রসাদ নিয়ে বোস ঠাকুরপো। মেয়েটা বলে কি শোন্— "জ্যেঠিমা শিবতলায় পুজো দিয়ে প্রসাদ নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। মিষ্টিগুলো সব প্রসাদী।" সত্যি! বোস ঠাকুরপো বিলেতে থেকে সাহেব হননি একটুও রে—আর মেয়েটাকে দেখলে তো মনে হয় সরস্বতী।'

জয়ন্ত বুঝল। বুঝল অনিরুদ্ধ বোস বুদ্ধিমান, এবং যতটা বুদ্ধিমান তিনি মেয়েটিও তার থেকে কম বুদ্ধিমতী নয়। মালতী দেবী মুগ্ধ হয়েছেন ছ'জন সম্পর্কেই।

মালতী দেবী কিন্তু তখনও থামেন নি, অনিরুদ্ধের থেকেও ইলোরার কথাই বেশী করে বলছেন তিনি। 'জানিস্ খোকা—সেই যে এসে রান্নাঘরের সামনে পিঁড়ি পেতে বসল মেয়ে উঠল এই আধঘণ্টা আগে।'

'তা এত কি গল্প হল তোমার সঙ্গে?'

'বোস ঠাকুরপো তো তাঁর নিজের গল্প করলেন, ঐ বিদেশে কি সব করেছেন—তার আর আমি কি বুঝব বল্? তোর বাবার গল্প করলেন। ওঁর স্ত্রীর কথা বললেন। এই আর কি?'

'আর মেয়ে?'

'মেয়ে তো, "জ্যেঠিমা, আমি এই রান্না শিখব—ঐ রান্না শিখব—" তা আমি বললাম এস মা—গরীব জ্যেঠিমা যা রান্না জানে একটু আধটু শেখাবে।'

'রান্না শিখবে ?'

'শিখবে না—বাঙালী ঘরের মেয়ে—আজ হোক কাল হোক যেতে তো হবে পরের বাড়িতে। রান্না একটু আধটু না জানলে কি করে হবে ?' বলেই যেন কি মনে পড়ে গেল মালতী দেবীর।

'হ্যাঁরে খোকা !' বলে একটু চুপ করে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন মালতী দেবী।

'কি ?' জয়ন্তও তাকাল মায়ের দিকে ?

'তোকে কাল বোস ঠাকুরপো 'রায়' পদবী নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন ?'

'হ্যাঁ—তা করেছিলেন।' এবার জয়ন্তের গলায় একটু বিশেষ কৌতূহল। তার মানে আজকেও এই প্রশ্নটা উঠেছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি ? ভদ্রলোকের এত কৌতূহল কেন ? যদিও কালকে একবার বলেছিলেন বটে—'বৌঠানকেই জিজ্ঞেস করব'—কিন্তু জয়ন্ত ওটাকে কথার কথা বলেই ধরে নিয়েছিল।

'কেন তোমাকেও জিজ্ঞেস করেছিলেন নাকি ?'

'না প্রথমে উনি ঠিক প্রশ্নটা তোলেন নি। মেয়েই বলল কথাটা।'

'মেয়ে বলল ?' আরেক দফা বিস্ময় জয়ন্তের।

'হ্যাঁ। মেয়েই তো—কি যেন সুন্দর নামটা—হ্যাঁ—'ইলোরা।' তা ইলোরাই হঠাৎ বলল "জ্যেঠিমা আসলে আপনারা কি ?"—তা আমি তো প্রথমে কথাটা ধরতেই পারিনি। ঐ খোলসা করল। 'রায়' তো ঠিক আসল পদবী হয় না—আগেকার জমিদার বা ঐ রকম ছোট-খাটো রাজারা 'রায়' নাকি কি উপাধি পেত নবাব-বাদশাদের কাছে।'

'আর অমনি তুমি তোমার শ্বশুর বংশের কত তালুক ছিল—কত নদী ছিল—কত পাহাড় ছিল এইসব গল্প লাগিয়ে দিলে তো ?' জয়ন্তের গলায় একরাশ বিরক্তি।

'হ্যাঁ আমি গোমুখ্খু হতে পারি, কিন্তু ছাগল নই' এবার ঝাঁঝের পালা মায়ের।

জয়ন্ত একটু থতমত খেল। সত্যিই তো। মা তাকে মাঝে মধ্যে বললেও কোনদিন তো কোন পাড়া-পড়শীর কাছেও তাদের পুরনো গল্প করেন নি। কথাটা বলা তার নেহাত্তই ভুল হয়ে গেছে।

জয়ন্ত মাকে ঠাণ্ডা করল। 'আরে আমি কি সে ভাবে বলেছি? তোমার কাছে যা শুনেছি তাতে এখানকার বোস বংশের থেকেও তো আমাদের অবস্থা একদিন আরও ভালোই ছিল—সেই প্রসঙ্গে উঠতে পারে কথাটা।'

'না। তোমার বাবাই যখন বোস ঠাকুরপোকে কোনদিন কিছু বলতে যাননি আজ আমি কেন বলব?'

ঘরের আবহাওয়াটা থমথমে হয়ে উঠল।

জয়ন্তই ভাঙল সেটা।

'আচ্ছা, মা—' গলার স্বরটা জয়ন্তের পক্ষে যতটা মোলায়েম ও মধুর করা যায় জয়ন্ত করল সেটা—মাকে আঘাত দিয়ে ফেলেছে—একটু ঠাণ্ডা করা দরকার।

'কি?' মা কিন্তু এখনও গম্ভীর?

'সত্যি—আমাদের আসল পদবীটা কি? জান তুমি?'

এবার কিন্তু জয়ন্ত চমকাল। মায়ের এরকম ভঙ্গিতে গাম্ভীর্যপূর্ণ গলা ও শুনেছে বলে মনে করতে পারল না।

'জানি বললেও আদৌ ঠিক বলা হবে না—জানিনা বললে মিথ্যে বলা হবে।'

'মানে!'

'মানেটা অবশ্যি আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। বোস ঠাকুরপো একটা ছোট্ট ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেওয়াতে মনে পড়ল।

'কি ঘটনা!'

'বোস ঠাকুরপো তখন নবনগর ছেড়ে চলে যাবার সব ব্যবস্থা করে

ফেলেছেন। খুবই ব্যস্ত। তারই মধ্যে দু'-একদিন আসেন। সেই রকম একদিনে—

জয়ন্ত তাকিয়ে থাকল মায়ের দিকে।

পাঁচ

পরের সন্ধ্যে অনিরুদ্ধর বাড়ি। সেদিন ইলোরাও আছে, ঘরোয়া শাড়ি পরে।

'সে দিনটা আমার এখনও মনে আছে। বুধবার। তোমার বাবার ঐ বুধবারই আবার ছিল সাপ্তাহিক ছুটির দিন। আমিও তখন ইস্কুলের চাকরি ছেড়েছি। দিনটাও ছিল বৃষ্টি বৃষ্টি—মেঘলা। বিকেল তিনটে নাগাদ—দু'জনে খেলে চলেছি দাবা—চলছে সিগারেট, তোমার মা দিয়ে গিয়েছেন দু'কাপ চা। এই সময়ে দরজায় জোর কড়া নাড়া।

"কে এল আবার এই সময়ে"—বলে তোমার বাবা দরজা খুলতে গেলেন।

ঘর থেকে দেখতে পেলাম ডাক পিওন। লোকটি পুরনো। অনেকদিন চিঠি বিলি করছে ও অঞ্চলে।

"—দেখুন তো এ চিঠিটা আপনার কি না?" তোমার বাবার হাতে একটা খাম ধরিয়ে দিল সে।

—তোমার বাবা চিঠিটা নিলেন। নিয়ে একবার ভালো করে দেখে বললেন—"হ্যাঁ"।

"—তা আপনার চিঠিতো চিরকাল রায় বলেই আসে—এ ভদ্রলোক আপনার পদবীটা বাদ দিয়ে কেবল নামটা লিখে ছেড়ে দিয়েছেন! নেহাত নবনগরের সব কটা বাড়ি আমার চেনা—ক'লকাতা হলে এ চিঠি কোনদিন পেতেন? ভদ্রলোককে লিখে দেবেন নাম ঠিকানাটা ঠিকভাবে লিখতে। তাও নামটাকে এমন ভাবে লিখেছেন—মনে হচ্ছে

আপনার পদবী আদিত্য!" বলে গজগজ করতে করতে পিওন চলে গেল। তোমার বাবা দরজা বন্ধ করে গম্ভীরভাবে এসে বসলেন দাবার ছকে—চিঠিটা তখনও হাতে ধরা।

আমি জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না—কি হয়েছে—?

তোমার বাবা যেন একটু এড়িয়েই গেলেন। বললেন, "দাদার চিঠি। চোখে ভালো দেখেন না। তাই বসন্তাদিত্য রায় লিখতে গিয়ে বসন্ত আদিত্য করে ফেলেছেন।"

আমি কিন্তু জানতাম, তোমার জ্যাঠামশায় তোমাদের দেশ—জগৎপুর না কি গ্রাম—সেখানকার ইস্কুলের শিক্ষক। তিনি কিন্তু তখনকার ম্যাট্রিক পাশ, সংস্কৃতটা জানতেন নাকি অসম্ভব ভালো। চোখে তিনি ঠিক দেখতে নাও হয়তো পারেন কিন্তু বসন্তাদিত্যকে বসন্ত আদিত্য করবেন কেন? সংস্কৃত জানা পড়াশুনা করা লোক! খটকা লাগল একটা। কিন্তু তোমার বাবাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করাটা শোভন মনে হল না। কেন না—

থামলেন একটু অনিরুদ্ধ। দম নেবার জন্যই বা। জয়ন্তের কৌতূহল কতটা সেটাও বুঝিবা জরিপ করছেন তিনি। জয়ন্তের মুখের ভাব তখনও নিস্পৃহ। ভিতরে ভিতরে যে একটা আলোড়ন চলছে সেটা সেও বুঝতে দিতে চায় না। দেখাই যাক না। ভদ্রলোক গল্পটাকে কতদূর টানেন—কিইবা বলতে চান তিনি!

ইলোরার মুখভাবটা লক্ষ্য করল জয়ন্ত। জয়ন্তের কেমন ধারণা হচ্ছে যে মেয়েটাও তার বাবার মতিগতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল! অবশ্য হতেই পারে—ইলোরাও তো ইতিহাস নিয়েই নাকি পড়াশুনা করেছে—এখনও নাকি চালাচ্ছে। এমন বাবা থাকতে সুযোগটা পুরোপুরি সদ্ব্যবহার না করাটা তো অপরাধই।

তবু প্রশ্নটা ইলোরাই করল।—'থামলে কেন?'

অনিরুদ্ধ গম্ভীর মুখে বললেন, 'চা বা কফি না খেয়ে আর কতক্ষণ বকবক করা যায়।'

ইলোরা ডাক দিল—'রামলাল।'

ভিতর থেকে রামলাল নামক ব্যক্তিটির সাড়া পাওয়া গেল—'কি ? চা না কফি ?'

অনিরুদ্ধ একবার জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চা'।

জয়ন্ত যে 'চা'টাই বেশী পছন্দ করে তা তিনি বুঝে ফেলেছেন।

তবে চায়ের জন্য অপেক্ষা করলেন না অনিরুদ্ধ।

'কেন না—তোমার বাবা চিঠিটা হাঁটুর তলায় চাপা দিয়ে আবার দাবায় বসলেন। মুখের মেঘ কিন্তু তখনও তাঁর কাটেনি। তাই খেলাটা আর সেদিন জমল না। বুঝলাম বসন্তদা অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছেন বেশ। আমিই তাই একসময়ে বৃষ্টির দোহাই দিয়ে উঠে পড়লাম।'

'ব্যস্! গল্প শেষ!' ইলোরার খেদোক্তি।

চা এসে গেছে। হাতে হাতে তিনটে কাপ ধরিয়ে দিয়ে রামলাল চলে গেল।

অনিরুদ্ধ খেই ধরলেন। 'আমার খটকাটা কিন্তু রয়েই গেল। আমার স্বভাব একটা—'

কথাটা শেষ করল ইলোরা, 'মাথায় কোন কিছু ঢুকলে সেটার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি ছাড় না।—এই তো ?'

'হ্যাঁ।' স্মিত হাসলেন একটু অনিরুদ্ধ। "আদিত্য!" এই শব্দটা আমাকে বারবারই ইতিহাসের পিছন দিকে টানছিল—কোথায় আমি পেয়েছি যেন! মূল নামের পরে পদবীই বল—উপাধিই বল। পেয়েছি! কিন্তু তখনকার মতো ইতি দিতে হল আমাকে ইতিহাস হাটকানোর পর্বে। কেন না—লণ্ডন যাওয়ার প্রস্তুতিতে আমার ব্যস্ততা—আমায় অন্য কোন কাজই আর করতে দিচ্ছিল না। তারপর একদিন লণ্ডন।'

'তাহলে কি আপনি বলতে চান লণ্ডনে যে রহস্যের কিনারা করতে চাইছিলেন তার সঙ্গে এর কোন যোগাযোগ আছে ?' জয়ন্তের গলায় বিনীত কিন্তু তীক্ষ্ণ প্রশ্ন।

অনিরুদ্ধ এবং ইলোরা দু'জনেই দু'জনের দিকে তাকালেন। জয়ন্তের চোখ এড়ালো না সেটা। অনিরুদ্ধও সেটা বুঝলেন! মনে মনে জয়ন্তের বুদ্ধির প্রশংসাও করলেন অনিরুদ্ধ। খুশিও হলেন। ভালো ছাত্র যখন জটিল প্রশ্ন করে পণ্ডিত শিক্ষক তখন খুশিই হন। অনিরুদ্ধ তাই বললেন—'আছে। তবে কতটা সম্পর্ক সেটা তো এখনই তোমাকে বলতে পারছি না।'

জয়ন্ত চুপ করে রইল। কিন্তু মনে মনে যে সে সন্তুষ্ট হয়নি সেটাও বুঝলেন বাকী দু'জনেই।

অনিরুদ্ধ তাই বোঝাবার ভঙ্গিতে বললেন—'রহস্যটা এমন একটা ব্যাপার—বুঝলে জয়ন্ত, তার কিনারায় না পৌঁছোলে অন্যকে বলে শুধু অসুবিধেতেই পড়তে হয়। তারও অসুবিধে, যে কিনারা করতে চাইছে তারও।'

'আপনি কাল মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তো আমাদের রায় পদবী এবং ঐ চিঠির ব্যাপারটা নিয়ে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু সেখানেও যে সুবিধে হয় নি তাতো শুনেছ নিশ্চয়।'

হ্যাঁ জয়ন্ত শুনেছে। চিঠিতে ঐ প্রায় তিরিশ বছর আগে বাবার নামটা কেন ওভাবে লেখা হয়েছিল—সে প্রশ্ন সেদিনকার প্রায় নববধূ মালতী কৌতূহলে পড়েই প্রশ্ন করেছিলেন বসন্তকে। বসন্ত স্বভাব বিরুদ্ধ ভাবে একটু অসন্তোষই প্রকাশ করেছিলেন সেদিন—এবং রহস্যজনক ভাবেই হঠাৎই দু'দিনের ছুটি নিয়ে জগৎপুরে চলেও গিয়েছিলেন তিনি। মালতীকে শুধু এই কথাটা শুনেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল যে, 'দাদা চিঠিতে এখনই একবার দেখা করতে লিখেছেন, কি সব জমি-জায়গার ব্যাপার!' মালতী আর কোন প্রশ্ন করতে সাহস পাননি। হাজার হলে তখনকার দিন তো—স্বামীর মুখে মুখে প্রশ্ন করাটা অপরাধই মনে করতেন মালতী।

জয়ন্ত মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোমাদের বিয়ের সময় প্রশ্ন ওঠেনি ?' এসব তো তখনকার দিনে একটা জরুরী ব্যাপার ছিল।'

মালতী সাদামাটা উত্তর দিয়েছিলেন, 'থাকতাম মামার বাড়িতে আশ্রিতা হয়ে। দু'বেলা দু'টো অন্ন দিতেন মামা—তারজন্যই কত কথা শুনতে হত! বাপ-মা মরা মেয়ের বিনা পণে—বিনা খরচায়, দোজবর নয় চাকুরে সুস্থ সবল তোমার বাবার মতো সচ্চরিত্র পাত্র জোগাড় করেছিলেন মামা—এইটার জন্যই আমি সারাজীবন কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে। ওসব প্রশ্ন তখনকার দিনে আমার করার কথাও নয়—প্রয়োজন তো ছিলই না।'

ব্যস্ ইতি।

অনিরুদ্ধ বা জয়ন্ত মালতী দেবীর কাছে আর কোন খবর পাননি। শুধু শুনেছিলেন দেশ থেকে বসন্তের ঘুরে আসার পর দাদা অনন্তের চিঠিতে ঠিকানা লেখা থাকত ঠিক মতো—আর বসন্তের মৃত্যুর পর চিঠি আসে জয়ন্তের নামে। যদিও উদ্দেশ থাকে মালতী দেবীরই—চিঠির শেষে থাকে তাই আং অনন্ত। অর্থাৎ আশীর্বাদক অনন্ত।

'তাহলে আপনার আর জানা হল না। আমাদের রায়ের পিছনে বা আগে কি ছিল সাহেব-বাহাদুর না আদিত্য।' জয়ন্তের গলায় কৌতুক।

'এখনও হল না—তবে জানা হয়তো এখনও যায়।' বললেন অনিরুদ্ধ। মুখে কিন্তু তাঁর কেমন যেন একটা চিন্তার ছাপ।

'কিভাবে বাপী?' ইলোরা একটা ছবির এ্যালবাম ওলটাতে ওলটাতে প্রশ্নটা আলতো করে ছুঁড়ে দিল।

জয়ন্ত অনেকক্ষণই লক্ষ্য করেছে—ইলোরা কয়েকটা এ্যালবাম দেখেই চলেছে—ফটোর। তবে জয়ন্তের সোফা থেকে সেগুলো কি ছবি তা বোঝা যাচ্ছে না। কৌতূহল থাকলেও জয়ন্ত সেটা প্রকাশ করে নি।

কিন্তু অনিরুদ্ধের জবাবে চমকাল জয়ন্ত।

'জয়ন্তের সাহায্যে।'

'আমার!'

'হ্যাঁ—তোমার মা বলছিলেন তোমার জ্যাঠামশায় বৃদ্ধ হয়েছেন, তোমাদের দেখতে চান—অনেকবারই লিখেছেন সে কথা। তা—'

কথাটা শেষ করতে দিল না ইলোরা।

'একদিন যান না—জ্যাঠামশায়ের কাছে। আপনার আপত্তি না থাকলে বাপী আর আমিও যেতে পারি।'

বলে কি মেয়েটা। একেই রামে রক্ষে নেই—সমস্ত বাহিনী। জীবনে যে জ্যাঠামশায়ের মুখই সে দেখল না ঐ তালুকদারির আঠাশ পর্ব রামায়ণ মহাভারত শুনতে হতে পারে এই ভয়ে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনিরুদ্ধের অনুরোধ জয়ন্ত এড়াতে পারল না।

প্রায় অনুনয়ের ভঙ্গিতেই তিনি বললেন—'না—না—আমাদের যাওয়াটা এই অবস্থায় ঠিক হবে না। একে বৃদ্ধ মানুষ; থাকেন শুনেছি একজন বহুকালের দাসীর ভরসায়। সেখানে জয়ন্তের যাওয়াটা আকস্মিক হলেও স্বাভাবিক। হয়তো কিছু বা তিনি বলতেও পারেন —কিন্তু আমাদের দেখলে সেটা আদৌ সম্ভব হবে না। বরঞ্চ সে রকম হলে জয়ন্তের দু'-একবার যাতায়াতের পর প্রয়োজনে দেখা যাবে।'

জয়ন্ত প্রায় নিরুপায়। তবু একটু ক্ষীণ কণ্ঠে আপত্তি তুলেছিল— 'মানে জ্যাঠামশায়—আদৌ তিনিও কিছু জানেন কি না—আর জেনেই বা—'

অনিরুদ্ধ প্রায় হাত ধরেন আর কি! 'আমার একটা গবেষণা হয়তো সফল হবে জয়ন্ত। তুমি আমার ছেলের মতো—তোমার কাছে এই সাহায্যটা আমি যদি প্রত্যাশা করি—সেটা আমার দিক থেকে যদি অনধিকার বলে মনে কর—' কথাটা যেন আটকে গেল তাঁর গলায়।

জয়ন্ত রাজী হল—হল না শুধু—নিজেকে তার একটু অপরাধীই মনে হচ্ছিল অনিরুদ্ধ বোসকে এমনভাবে অনুনয়ের পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য।

ঠিক হল পরের রবিবার সম্ভব হবে না—কেননা একদিনে জায়গাটা চিনে বার করে হয়তো ফিরে আসা সম্ভব হবে না। তাই হয় একটা শনিবার তার সঙ্গে জুড়তে হবে নয় সোমবার। অর্থাৎ ছুটি নিতে হবে অফিস থেকে। তা এ শনি বা সোমে হবে না—অফিসে অসুবিধে হবে—তাই পরের শনিবার ছুটি নিয়ে চলে যাবে সকাল বেলা—তাহলে রবিবার সন্ধ্যে নাগাদ নবনগর ফিরতে পারবে।

এতক্ষণে বাপ-মেয়ের মুখে হাসিটা ফুটল অনাবিল। যেন আল্পস্ জয় করেছেন নেপোলিয়ন!

ইলোরা সোফা ছেড়ে উঠল। আজ জয়ন্তের রাতের খাবার নেমন্তন্ন আছে এ বাড়িতে। উঠল সে। দিয়ে গেল এ্যালবামগুলো জয়ন্তকে দেখতে। অনিরুদ্ধ বই এর আলমারি থেকে মোটা সোনার জলে লেখা চামড়া বাঁধানো দু'খানা বই ও একটা সাধারণ রেকসিনে বাঁধানো মোটা খাতা টেনে নিলেন। জয়ন্তের তখন সে দিকে নজর নেই। থাকলে দেখতে পেত বই দু'টোর নাম 'ভয়েজেস এ্যাণ্ড একস্‌পিডিশনস অব্ বেঙ্গলীস'—বাঙালীদের সমুদ্রযাত্রা ও অভিযান—লেখক ডঃ অনিরুদ্ধ বোস। লণ্ডন থেকে বাঁধানো। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে নাম লেখা আছে। খাতাটার বাইরে কিছু লেখা নেই—অনিরুদ্ধ সেই খাতাটাই আগে খুললেন।

জয়ন্তের চোখ না পড়ার জন্য দোষী নয় সে। দোষ যদি কিছু থাকে সে ঐ নিরীহ এ্যালবামগুলোর।

একটু আগেই ওর মনে উদয় হয়েছিল 'আল্পস্ জয় করেছেন নেপোলিয়ন'—উপমাটার। কিন্তু প্রথম এ্যালবাম খুলেই যে ছবিটা তার নজরে এল সেটা আল্পস্ পর্বতমালারই। তারপর—কোনটাতে ইলোরা পাহাড়ে চড়ছে—যাকে বলে মাউণ্টেনিয়ারিং—কোনটাতে বাইক চালাচ্ছে—কোনটাতে ঘোড়ার উপরে ছুটন্ত সওয়ার, কোনটাতে রাইফেল নিয়ে চাঁদমারি ভেদ করছে। পাতার পর পাতা এই সব ছবি!

'এ কি মেয়েরে বাবা ঃ না জানে কি ?' মনের বিস্ময়টা অস্ফুটস্বরেই বেরিয়ে এসেছিল বোধহয়।

অনিরুদ্ধ অনুভব করেছিলেন। তৃতীয় নয়ন আছে ওঁর একটা বোধকরি। কিছু বললেন না। বললেন—'ছ'একটা এ্যালবামে ওর বাপের ছবি ঠাঁই পেয়েছে কি না দেখতো।'

আছে, মোট সাতখানা এ্যালবাম। চারখানা মেয়ের—তিনখানা বাপের।

কিন্তু—এ সব কোথাকার ছবি! লণ্ডন না হয় বোঝা গেল। বাকীগুলো! দু চারটে পারিবারিক ছবি যে ঠাঁই না পেয়েছে তা নয়—ইলোরার মায়ের ছবি তো আছেই—কিন্তু সেগুলোর সংখ্যা নেহাতই নগণ্য। অন্যগুলো সবই অপরিচিত। কেবল এইটুকু ধারণা হল জয়ন্তের সেদিন যে কথার ছলে আফ্রিকার জঙ্গলের কথা বলেছিলেন এগুলো সেখানকারই মনে হয়।

হঠাৎ অনিরুদ্ধ উঠে এলেন। জয়ন্তের চোখ তখনও নিবদ্ধ তিন চারটে ছবির উপর। বারবারই দেখছে। অনিরুদ্ধ দেখালেন—'এই যে ছবিটা দেখছ এখানে—লিভিংস্টোন—নাম শুনেছ তো? বিখ্যাত ভূ-পর্যটক ও আবিষ্কারক—এখানে মারা গিয়েছিলেন ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে। জায়গাটা এখন জাম্বিয়ার অধীনে। আর এই যে জায়গাটা—এখানে লিভিংস্টোন পৌঁছোন—১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে। আর এই যে ছবিটা—এখানে তাঁর দেখা হয় স্ট্যানলির সঙ্গে, আর এক বিখ্যাত পর্যটক—সালটা—১৮৭১। এ জায়গাটা এখন তানজানিয়ার আয়ত্তে।'

কথা বলবে কি জয়ন্ত। এ কাদের পাল্লায় পড়ল সে?

অনিরুদ্ধ বলেই চলেছেন 'এটা লেক ভিক্টোরিয়া' আর এই পাহাড়টা—রুয়েনজরি, কঙ্গো—উগাণ্ডার মাঝে—এটা হচ্ছে স্ট্যানলি জলপ্রপাত—কঙ্গোর মাঝে।'

—'তোমরা কি খাওয়া দাওয়া করবে না—কি?' ইলোরা ঢুকল।

অনিরুদ্ধও লজ্জিত। 'তাইতো খেয়ালই নেই। জয়ন্ত ওঠ, অনেক রাত হয়েছে।'

এ্যালবাম বন্ধ করল জয়ন্ত। গল্প আর ছবি তাকে ঘামিয়ে দিয়েছে একটু মুখে চোখে জল দিতে পারলে হত।

বললও সে।

ইলোরা তাকে তখনই বাথরুম দেখিয়ে দিল।

সাবান তোয়ালে সবই আধুনিক। হাতমুখ ধুয়ে খাবার টেবিলে এসে বসল জয়ন্ত। আয়োজন প্রচুর—খিদেও অসম্ভব। কিন্তু জয়ন্ত কিছুই খেতে পারছে না! মাথার মধ্যে কি একটা চিন্তা যেন। বাপ আর মেয়েতে অনুযোগ করলেন অনেক—। বারবারই জয়ন্ত মুখে বলে চলল—'না এই তো খেয়েছি—এই তো খাচ্ছি।'

জয়ন্তকেই আগে মুখ ধোবার অনুরোধ জানালেন অনিরুদ্ধ। মুখ ধুয়ে জয়ন্ত বাইরের ঘরে এসে বসল। বাপ-মেয়ে তখনও ভিতরে। জয়ন্তের মাথাটা ধরে গেছে, গরমে না অদ্ভুত সব চিন্তায়—কে জানে! আদিত্য—আফ্রিকার জঙ্গল—কোথাও কি কিছু···। তাই—তাই ধপ্ করে বসে পড়ল সে বেখেয়ালেই অনিরুদ্ধের সোফায়। সামনে ছোট টেবিলে তখনও খোলা রয়েছে অনিরুদ্ধের সেই বাঁধানো খাতা—যা পড়তে পড়তেই উনি উঠে গিয়েছিলেন জয়ন্তকে এ্যালবামের ছবি বোঝাতে। অন্যমনস্ক ভাবেই জয়ন্তের চোখটা চলে গেল সেই পাতায়। জয়ন্তের ধরামাথা ঝিমঝিম করে উঠল। খোলা পাতাটায় বড় বড় অক্ষরে টাইপ করে যে অধ্যায়টা শুরু হয়েছে তার নাম 'কিং নরেন্দ্রাদিত্য এ্যাণ্ড হিজ ফ্যামিলি ব্রাঞ্চেস্! রাজা নরেন্দ্রাদিত্য এবং তাঁর পরিবারের শাখা প্রশাখা।' তারপরে পাতা জুড়ে একটা অদ্ভুত হারের অর্ধেকের ছবি। একে রাজা নরেন্দ্র আদিত্য! তার সঙ্গে হারের অর্ধেক! ব্যাপারটা নিয়ে জয়ন্ত আর ভাবতে পারছে না। কোন রকমে ঝিমঝিম ভাবটা কাটাল জয়ন্ত। আস্তে আস্তে সোফাটা থেকে উঠে পড়ল সে। এই সময়েই অনিরুদ্ধ এবং ইলোরা একসঙ্গে ঘরে ঢুকলেন।

অনিরুদ্ধ কিন্তু চমকে উঠলেন জয়ন্তের মুখের চেহারা দেখে— 'কেমন যেন একটা জ্বর জ্বর ভাব!' এগিয়েও এলেন ত্বরিত গতিতে 'কি হল শরীর খারাপ নাকি? তাহলে বরঞ্চ আমার এখানে থেকে যাও—রামলালকে দিয়ে আমি না হয় একটা খবর বৌঠানকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

কোনরকমে জয়ন্ত বলল—'না—তাহলে মা চিন্তায় পড়ে যাবেন। আমার—আমার কিছু হয়নি—আমি বরঞ্চ এখন যাই—' দু'জনকে অবাক করে জয়ন্ত একটু টলতে টলতেই বেরিয়ে গেল। ইলোরা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল—অনিরুদ্ধ ইশারায় থামিয়ে দিলেন। নীরবে এসে গেটটা খুলে দিয়ে কেবল বললেন 'সাবধানে যেও।'

জয়ন্ত টলতে টলতে আধো অন্ধকার পথ ধরে এগোল। জয়ন্ত জানেনা সে কোথায় চলেছে—!

গেট বন্ধ করে এসে অনিরুদ্ধ খোলা খাতাটার পাতার দিকে একবার তাকালেন—একবার অন্ধকারে অপসৃয়মান জয়ন্তের দিকে। মুখে একটা স্মিত রহস্যের হাসি ফুটে উঠল তাঁর।

ইলোরা তখন একটা ছোট—হাতে বওয়া যায় এমন বাক্স খুলছে—। তার থেকে যেটা সে বার করল তাকে এক কথায় বলা যায় ছোট আধুনিক অটোমেটিক—মুভিক্যামেরা। বিলেতী জিনিস। একটানা ছবি ওঠে—সঙ্গে রয়েছে প্রজেকটর। জাপান থেকে আনিয়েছে সে—অনেক অনেক দাম।

কাজে লাগবে এবার—মনে মনে ভাবল ইলোরা।

জয়ন্ত তখনও পথ চলছে—। খেয়াল নেই—দিকভুল হল কিনা! চলছেই—! কিন্তু এতটুকু পথ তার আজ এত সময় লাগছে কেন?

ছয়

তারপর দু'দিন। জয়ন্তের জীবনে সবকিছু এমন ব্যতিক্রম হয়নি। না গেল দৌড়োতে, না গেল সাঁতারে, না গেল কোন মিটিংএ বা বক্তৃতা দিতে।

মালতী দেবী বেশ চিন্তাতেই পড়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলে একই জবাব—শরীরটা ভালো নয়। 'কিন্তু জ্বর তো হয়নি তোর!' মালতীদেবী গায়ে হাত দিয়ে বলেছিলেন।

'জ্বর না হলে শরীর খারাপ হতে নেই! সেদিন অফিসে হাতের এই কব্জিতে একটা চোট লেগেছিল'—মিথ্যেই বলল জয়ন্ত। আপাতত মায়ের হাত থেকে তো বাঁচা যাক।

কিন্তু মায়ের মন! 'তা একবার ডাক্তার দেখানো দরকার।'

আচ্ছা ফ্যাসাদ্। 'দেখি, দু'—একদিন'। জয়ন্ত চুপ করে যায়।

মালতী দেবীও চিন্তায় পড়লেন। কব্জিতে চোট তো মুখ গম্ভীর—কথা নেই! সেদিন বোস ঠাকুরপোর বাড়ি থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে এসে অবধি ছেলেটা গুম মেরে গেল কেন?

তৃতীয় দিন কথাটা রাতে তুলবেন ভেবেছিলেন মালতী দেবী।

দু'দিন ধরে জয়ন্ত ভেবেই চলেছে—ভাবনার কোন দিকবিদিক অবশ্য নেই! থাকবেই বা কি করে। সঠিক পথে চিন্তা করার ইঙ্গিত তো সে পায়নি।

তৃতীয়দিন অফিসে বসে ভাবছে সে—মাকে বলতে হবে জগৎপুর যাবার কথা! অফিসে একটা ছুটির দরখাস্তও করতে হবে। মনে মনে তারই মুসোবিদে করছিল জয়ন্ত। জয়ন্তের অন্যমনস্কতা মালিক চৌধুরি বাবুদেরও নজর এড়ায়নি। কিন্তু ও নিয়ে কোন জিজ্ঞাসাবাদের ধার দিয়ে ওঁরা যাননি। 'হয়েছে হয়তো একটা কিছু!' ভাবখানা এই নিয়ে তাঁরা বসেছিলেন।

তা—না হল মালতীদেবীর ছেলেকে কিছু জিজ্ঞাসা করা—না হল জয়ন্তের দরখাস্তের মুসোবিদে করা—সব চিন্তার ছেদ ঘটিয়ে ঐ দিনই এসে হাজির হল হরলাল—জগৎপুর থেকে জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর খবর নিয়ে।

যাঃ। অনিরুদ্ধ বোসের গবেষণার শেষ আশার রেশটুকুও চলে গেল।

বাসে যেতে যেতে জগৎপুরের পথে জয়ন্ত এই কথাই ভাবছিল।

কিন্তু একটা অভদ্রতা হয়ে গেছে! আসার আগে অনিরুদ্ধের কাছে একটা খবর দিয়ে আসা উচিত ছিল।

কি আর করা! দেওয়া হয়ে ওঠেনি যখন খবরটা! কম তাড়াহুড়ো করতে হয়েছে তাকে!

কিন্তু জ্যাঠার মৃত্যুর তৃতীয় দিন!

জগৎপুরের গ্রামবাসী অবাক হয়ে দেখল অনন্ত মাষ্টারের ভাঙা বাড়ির সামনে এসে থামল এক ঝকঝকে মোটর। নামতে নামতেই ধুতি-পাঞ্জাবী পরা এক ভদ্রলোক—এমন চেহারা এ তল্লাটে হরলাল দেখেছে বলে মনে করতে পারল না- তা সেই হরলালকেই পেয়ে গেলেন ভদ্রলোক সামনে আর প্রশ্নটা করলেন ঠিক এইভাবে 'আচ্ছা ভাই এটাই তো মাষ্টারমশাই—মানে অনন্তবাবুর বাড়ি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—কিন্তু তিনি তো—'

'জানি ভাই—তিনি দেহত্যাগ করেছেন। তা তাঁর ভাইপো জয়ন্ত কোথায়?'

গাড়ির আওয়াজ কানে গিয়েছিল জয়ন্তেরও। এবার এল অনিরুদ্ধ বোসের গলার স্বর। তড়িঘড়ি বেরিয়ে এল সে।

নাঃ। এ ভদ্রলোক সত্যিই ভূপর্যটক। কোন ঠিকানা নেই—কিন্তু ঠিক খোঁজ করে চলে এসেছেন।

লজ্জায় পড়ে জয়ন্ত কিছু বলতে যাচ্ছিল—

গম্ভীর গলায় অনিরুদ্ধ বললেন—'তোমায় লজ্জা পেতে হবে না

জয়ন্ত। কিভাবে তাড়াতাড়ি তুমি এসেছ সব জানি। যাক সব কথা পরে হবে। আপাতত এমন কেউ আছে যাকে দিয়ে গাড়ির জিনিস-গুলো নামানো যায়—মানে আমি ঠিক—'

এগিয়ে এল হরলাল। 'আমি আছি।'

'আপনি ব্রাহ্মণ কি?' অনিরুদ্ধের প্রশ্ন।

যদিও চমকাবার মতোই কথাটা। হরলাল কিন্তু চমকাল না।

'নিশ্চয়। আমার বাবাই তো এঁদের কুলপুরোহিত।'

'ও—তা ভাই আপনার চান-টান হয়েছে?'

বাবাঃ এত কূট প্রশ্নও করতে পারেন ভদ্রলোক।

কিন্তু জয়ন্ত না জানলেও অনিরুদ্ধ জানেন গ্রামে এসব শুচিতাবোধ একটু বেশীই।

'হ্যাঁ—চান করেই তো এলাম।'

'তাহলে ভাই গাড়ির জিনিসগুলো নামিয়ে আনবেন? আমরা আর হাত দিই না—অশৌচের কাজ তো—'

হরলাল উৎসাহিত হয়েই এগিয়ে গেল। মালতী দেবীও এসে দাঁড়িয়েছেন। বোস ঠাকুরপোকে দেখে মালতী দেবী ভরসা পেয়েছেন বেশ।

একটু বুঝি বা স্বার্থের বোধই তাঁর জেগে উঠেছিল—নিজেদের আর্থিক অবস্থা তাঁর থেকে কে আর ভালো জানে! এখানে এসে যা বুঝেছেন অনন্তেরও দিন চলত কায়ক্লেশে। এমতাবস্থায়—'

তা অনিরুদ্ধ এসেছেন। গাড়ি থেকে জিনিস নামাচ্ছে হরলাল —টিনটিন গাওয়া ঘি। বিশুদ্ধ গোবিন্দ ভোগ চাল। মিষ্টি, ফল!

আর নামল ইলোরা। একেবারে ঘরোয়া শ্যামলা বাংলার এক ঘরোয়া মেয়ে। লালপাড় সাদা একটা তাঁতের শাড়ি আর সাদা জামা। তার হাতে একটা ছোট বাক্স।

জয়ন্ত ভাবল—কি রে বাবা—জামাকাপড় নাকি? মেয়েটা কি

এখানে এখন আস্তানা গাড়বে—তাহলে তো গাঁয়ের লোক! যাক গে দেখাই যাক।

মালতী দেবী খুব খুশি। বিশেষ করে যখন সবশেষে নামল সাত ঘড়া গঙ্গার জল।

'বুঝলেন বৌঠান—এ ক'দিন কলসীর গঙ্গাজলেই চানটান গুলো কষ্ট করে সারুন। আরো এনে দেব আমি। আপনার চিন্তা নেই।'

ইলোরা ততক্ষণে বাড়ির ভিতরে। বাড়িটা এক চক্কর ঘুরে এল সে। তারপরই বাক্সের ঢাকনা খুলে বার করল সেই অটোমেটিক মুভি ক্যামেরা। সারা বাড়িটার, ঘরের আসবাবপত্রের মায়—সব কোণ—দরজা জানালা সব কিছুর। পাগল আর কি।

ততক্ষণে বার্তা রটে গেছে।

গ্রামবাসীদের ভিড় জমছে—কৌতূহল আছে—আছে আগ্রহ। অনন্ত মাষ্টারের এমন সব আত্মীয় থাকতেও বুড়োটা বিনে চিকিৎসেয়—বিনা যত্নে মারা গেল!

তা অনিরুদ্ধও নিজের পরিচয় দিলেন বৃদ্ধদের কাছে 'বসন্তদা—আমার দাদার মতোই ছিলেন। অনন্তবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে ওঠেনি। আমি চাকরি নিয়ে বহুদিন বাইরে ছিলাম। তাই নেহাতই দুর্ভাগ্য।'

জয়ন্ত খেয়াল করল অনিরুদ্ধ তাঁর বিলেত যাওয়া-টাওয়া একেবারেই উল্লেখ করলেন না।

বৃদ্ধ গ্রামবাসী দু'-একজন যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা কিন্তু প্রশংসাই করলেন অনিরুদ্ধের। বিপদের দিনে এসে দাঁড়ানোই সত্যিকারের আত্মীয় বন্ধুর কাজ।

অনিরুদ্ধ তাঁর সুন্দর কথায় গ্রামবাসীদের মুগ্ধ করে ফেললেন—তার থেকেও বুঝি ইলোরা করল বেশী। বেশ বুঝে শুনে বৃদ্ধ দেখলেই একটা করে প্রণাম ঠুকে দিল সে। বৃদ্ধদের কাছে এটা যথার্থ বিনয়ের লক্ষণ।

ইলোরা কিন্তু ছবি তুলেই চলেছে।

এরই মধ্যে ধীরে ধীরে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এসে উপস্থিত হলেন হরলালের বাবা অশীতিপর বৃদ্ধ মতিলাল ঠাকুর। কানে কম শোনেন —চোখেও দেখেন খুবই কম। কোনরকমে পরিচয় পর্ব সমাধা হল।

অনিরুদ্ধ ওরই মধ্যে শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা পাকাপাকি করে ফেললেন।

সমবেত গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্য করে বললেন—আপনারাই দেখে-শুনে সব ভার যেমন এতদিন নিয়েছেন এই কাজটাও আপনারাই উদ্ধার করে দেবেন দয়া করে। জয়ন্তের তরফ থেকে বৌঠান আমাকে এ কথাটাই আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাতে বলেছেন।' গ্রামের প্রথা অনুযায়ী বয়স্করা আসতেই মালতী দেবী ভিতরে চলে গিয়েছেন।

আবালবৃদ্ধ গ্রামবাসী, এঁদের বিনয়ে বিগলিত। শ্রাদ্ধের যে আয়োজন হবে বোঝা গেল তাতে গ্রামবাসী মনে মনে পুলকিত— কুলপুরোহিত যতটুকু শুনতে পারলেন তাতে তাঁর দন্তহীন মুখ দিয়ে যে কথা কটা বোঝা গেল - তাতে মনে হল তিনি বলছেন—'এটাই এ বংশের উপযুক্ত।'

বংশের উপযুক্ত! কথাটা অনিরুদ্ধের কানে গেছে, জয়ন্তেরও। কিন্তু দু'জনের চোখাচোখি হওয়া সত্ত্বেও কেউ আর এ নিয়ে কোন প্রশ্ন করলেন না।

অনিরুদ্ধ এবং ইলোরা চলে গেলেন; সন্ধ্যের একটু আগে। তারপর রোজই একবার করে তাঁরা আসতেন—সঙ্গে আসত শ্রাদ্ধের উপকরণ - বিশেষ করে গঙ্গাজলের কোন খামতি নেই।

তবে রাতে কোনদিনই তাঁরা থাকতেন না।

অবশেষে এল শ্রাদ্ধের দিন—তার আগে শ্রাদ্ধের নিয়মানুযায়ী ক্ষৌরকর্মাদির নির্দিষ্ট দিনে লেগে গেল গোলমাল। হাতপায়ের নখ কাটা হয়ে গেছে—জয়ন্তের এ ক'দিনের না কামানো দাড়িগোঁফও কামানো হয়ে গেছে—মাথা কামাতে যাবে - হরলাল ছিল সামনে - হাঁ হাঁ করে উঠল—'না—মাথা কামানো চলবে না।'

তার মানে! গাঁয়ের আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা ঘোরতর আপত্তি তুললেন—এ আবার কি কথা হিন্দুর ছেলের পিতৃশ্রাদ্ধ! জ্যেষ্ঠতাত এখানে পিতার সমান—তাঁর শ্রাদ্ধে—মাথা কামাবে না? এ আবার কোন অনাচার!

ঝগড়া বেধে উঠল ক্রমশ। বাধ্য হয়ে এগিয়ে আসতে হল মতিলালকে, তিনি তখন অন্যত্র পুজোআচ্চার আয়োজন করছিলেন—এগিয়ে এলেন আরো দু'-একজন অতি বৃদ্ধ।

তাঁরাই মীমাংসা করলেন।

মীমাংসাটা হরলালের দিকেই গেল। মতিলাল বললেন তাঁরাও বংশ পরম্পরায় এই আচারই পালন করিয়েছেন। এঁদের কোন এক পূর্বপুরুষের নির্দেশ অনুযায়ীই এটা চলে আসছে—।

আর অতিবৃদ্ধরা। তাঁরা বললেন অনন্ত যখন পিতৃশ্রাদ্ধ করেছিলেন সে স্মৃতি তাঁদের মনে আছে—অনন্তও মাথা কামাননি। বসন্ত তখন এত শিশু যে তার সে প্রশ্নই ওঠে নি।

মীমাংসায় মালতী দেবীকেও আনার কথা হয়েছিল। বসন্তের শ্রাদ্ধে তিনি কি করেছিলেন?

মালতী দেবী বাড়ি থেকেই জানালেন—প্রশ্নটা ওঠে নি কেননা শ্রাদ্ধ তাঁকেই করতে হয়েছিল—জয়ন্ত তখন নেহাত দুগ্ধপোষ্য। ফলে—

শেষ পর্যন্ত মাথা না কামিয়েই জয়ন্তের ক্ষৌরকর্ম শেষ হল। খটকাটা কিন্তু জয়ন্তের মনে থেকেই গেল। অনিরুদ্ধ ছিলেন না সেখানে।

ইলোরা কেবল ছবি তুলে চলেছে। মেয়েটা যেন এই অজগাঁয়ে এসেও নিজেকে মিশিয়ে ফেলেছে।

শ্রাদ্ধ হল। ভোজ হল। কোথাও কিন্তু অনিরুদ্ধ উপস্থিত থাকেন নি। গ্রামবাসীরাও একটু অবাক হয়েছিলেন—কিন্তু অনিরুদ্ধই তাঁদের বোঝালেন—'এখানে ওখানে চাকরি করে বেড়িয়েছি আমার

কি সেই শুদ্ধ শরীর আছে—যে এরকম একটা পবিত্র কাজে থাকব ? আপনারা থাকলেই হবে।'

অনিরুদ্ধের বিষয়ে সকলেই বাহবা দিয়েছিল।

জয়ন্ত কিন্তু লক্ষ্য করেছে বাপ না থাকলেও মেয়ে আছে—তাকে নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠেনি।

জয়ন্ত মনে মনে ভেবেছে অনিরুদ্ধের কৌতূহল মেটাবার শেষ স্থল অনন্ত চলে যাওয়াতে অনিরুদ্ধ বোধহয় ভেঙেই পড়েছেন তাঁর রহস্যের আর কিনারায় পৌঁছোন হল না দেখে।

শ্রাদ্ধের মন্ত্রে পূর্বপুরুষদের নাম উচ্চারণ করতে হয়—পদবী বলতে হয়। যতটুকু উচ্চারণ মতিলালের দন্তহীন মুখে শোনা গেল—তাতে 'অনন্ত আদিত্য রায় দাসস্য' এটুকুই বুঝল জয়ন্ত।

তা হলে ? ব্যাপারটা কিছুই না! জয়ন্ত শ্রাদ্ধের সকালে বসেও এটাই ভেবেছিল।

কিন্তু ভোজন পর্বের শেষে চমকটা খেল ঐ অশীতিপর এবং নবতিতম দুই বৃদ্ধের মুখে কথাটা শুনে—। 'একি যা-তা বংশ— আদিত্য বংশ বলে কথা—শুনেই এসেছি রাজার বংশ!'

মাথাটা নড়ে গিয়েছিল কি শুধু শুধু জয়ন্তের!

সাত

পরের দিন জয়ন্ত কৌতূহল দমন করতে না পেরে চলে গেল ঐ দুই বৃদ্ধের বাড়ি। 'আপনারা কাল বললেন আদিত্য বংশ—রাজার বংশ! কথাটা কি একটু বুঝিয়ে বলবেন ?'

একজন যিনি আশির কোঠায় তিনি বললেন, 'কথাটা আমি শুনেছিলাম আমার বাবার কাছে। তোমাদের পূর্বপুরুষদের নাকি কোথায় একটা রাজত্ব ছিল—তখন তোমাদের পদবী ছিল আদিত্য। তা অনন্তও প্রথমদিকে 'অনন্ত আদিত্য'ই লিখত নিজের নাম—

পরের দিকে কি হল জানিনা অনন্তাদিত্য রায় বলেই তো নামটা লিখত।'

একই কথা প্রায় বললেন নব্বই বছরের বৃদ্ধ। যোগ করলেন শুধু এইটুকু—' 'আদিত্য' পদবীটা তোমাদের পুরনো দিনের পদবী তো—এরকম পদবী হয়তো সত্যিই রাজ-রাজড়াদেরই থাকত—তা এসব প্রশ্ন আজকালকার ছেলে-ছোকরারা তুলতেই পারে—কোথায় ছিল রাজত্ব—বোঝই তো বাবা। তাই মনে হয়—এ রকম অহেতুক কৌতূহল যাতে নতুনকালের ছেলেরা তুলে ওকে বিব্রত না করে তাই বোধহয়!' আর কিছু বলতে পারলেন না ইনিও।

বোঝা যাচ্ছে। রায়টা সত্যিই তাদের আসল পদবী নয়। কিন্তু কিসের রাজত্ব কেনই বা এই রায়ে পরিবর্তন!

ছুটল জয়ন্ত মতিলালের কাছে। দু'শ' বছরের কুলপুরোহিত বংশ। অনেক কিছুই জানবেন তিনি।

কিন্তু সেখানেও হতাশা।

'আমরা তো মূল পুরোহিত বংশ নই বাবা। আমার ঠাকুর্দার বাবা ছিলেন মূল পুরোহিত বংশের মেয়ের ছেলে। তখন যিনি কুলপুরোহিত ছিলেন তিনি পুত্রহীন অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। তাই কাজটা বর্তায় মেয়ের বংশের ঐ আমার প্রপিতামহের উপর। তবে আদিত্য বংশ রাজার বংশ এটা আমি শুনেছি। কবে কোথায় ছিল সে রাজত্ব তা বলতে পারব না—তোমার জ্যাঠাও এ বিষয়ে আমার কাছে কোনদিনই কিছু বলেননি। তবে যেটুকু আমার বংশ থেকে শুনেছি—শ'তিনেক বছর আগে তোমাদের পূর্বপুরুষরা এখানে চলে আসেন। বহু সম্পত্তিই তখন ছিল তোমাদের। তোমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে আসেন আমার প্রপিতামহের মাতামহের পূর্বপুরুষরা। কিন্তু ঐ তিনশ' বছর আগে কোথাও একটা পত্তন তাঁদের ছিল—সেটাও নাকি আদি পত্তনী নয়।

'আর আদিত্য থেকে রায়! ওটার ব্যাপারে তোমার বাবার

একটু জোরাজুরিই ছিল। ও তো ক'লকাতার দিকে চাকরি করতে গিয়েছিল—সেখানে নাকি আদিত্য পদবী নিয়ে ওকে অনেকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করত—বসন্তের আবার জেদ ছিল বেশী—তা ওই একদিন এসে অনন্তকে বোঝাল—এসব পুরনো ব্যাপার আঁকড়ে থাকলে চলবে না। লোকে সাতকাহন ইতিহাস জিজ্ঞাসা করে। বসন্ত আবার বিশ্বাসই করত না যে আদৌ তোমাদের কোন রাজত্ব কোনদিন ছিল। তা ঐ জোর করে দাদার উপর 'রায়' টা চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। তবে—'

'তবে?' জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করেছিল। মনে মনে যদিও সে তার বাবার যুগোপযোগী চিন্তা-ভাবনার প্রশংসাই করল।

'তবে—কিছু একটা ছিল। নইলে অনন্তকে দেখেছি তো—আমার থেকে ছোটই তো ছিল। ওর বিশ্বাস ছিল—ছিল একটা কিছু তোমাদের!'

'আপনি শ্রাদ্ধের সময় তো রায় বলেই উল্লেখ করলেন আমাদের।'

'ঐ রকমই নির্দেশ ছিল বাবা, তোমার জ্যাঠামশায়ের। থাকতে তো কোনদিন এলে না—হয়তো জানতে পারতে বংশের ইতিহাস—তা ও বলে গিয়েছিল আমাকে, "ঠাকুর মশাই বসন্তের ছেলেই তো শ্রাদ্ধ করবে—তা আপনি বেঁচে থাকলে রায় বলেই উল্লেখ করবেন। আর হরলালকে যদি কাজ করতে হয় তবে ও তো আমাকে রায় বলেই জানে। আদিত্যরা শেষ হয়ে গেছে ঠাকুর মশাই—"।'

জয়ন্ত উঠল। মনটা খারাপ হয়ে গেল মৃত জ্যাঠামশায়ের শেষ খেদোক্তি শুনে। 'আদিত্যরা শেষ হয়ে গেছে।'

হয়তো সত্যিই কিছু ছিল কোন একদিন কোন এক জায়গায়। বৃদ্ধ গ্রামবাসী মাষ্টার অনন্ত ভুলতে পারেননি স্মৃতি—বসন্ত যাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিলেন!

জয়ন্ত এবার যেন একটু ব্যথিতই হল। অনিরুদ্ধকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে এইটুকু শুনে—তাঁর রহস্যের কিনারা এতে হবে কিনা তিনিই

জানেন। কিন্তু জয়ন্তের মনে এ যে একটা নতুন কৌতূহল খোঁচা দিয়ে গেলেন যুগপৎ অনিরুদ্ধ এবং মতিলাল—এর কি হবে!

জয়ন্ত চটকলে ইউনিয়ন করা নতুন চিন্তাধারার যুবক। কিন্তু এই গ্রাম্য পরিবেশে অনন্তের ভাঙা বাড়িতে বসে, মনটা কেন উদাস হয়ে যায় হারিয়ে যাওয়া আদিত্য বংশের কথা শুনে!

জয়ন্ত মনে মনে বিচার করল। নিজেকে যাচাই করল। বুঝল —সমস্ত ইতিহাসটা জানতে পারলে হয়তো মনের এই খুঁতখুতোনিটা ও দমাতে পারত। কিন্তু তার হদিস কোথায়। চোখের সামনে অনিরুদ্ধের ঘরে দেখা খাতাটার খোলা পাতা যে ভাসছে ছবির মতো।

শ্রাদ্ধের পরের দিন দুপুরে যখন অনিরুদ্ধ এলেন—জয়ন্ত সবই বলল। অনিরুদ্ধ হাঁ—না কোন কিছু না বলে শুনলেন সব।

তারপর ও প্রসঙ্গে না গিয়ে বললেন, 'তাহলে আর কি করা! ঐ শ্রাদ্ধের পর বাকী আত্মীয় পরিজন ভোজন মানে যাকে বলে নিয়মভঙ্গ না কি ওগুলো সেরে ফেলে—এখানকার একটা ব্যবস্থা করে তুমি কবে যেতে পারবে? আমি আবার কদিন থাকব না—। তা যেদিন তোমরা যাবে—সেদিন আমি গাড়িটা পাঠিয়ে দেব।'

ততক্ষণে মালতী দেবী ঘরে ঢুকেছেন। 'মেয়েটাও কি আপনার সঙ্গে যাবে?'

'না—ও থাকবে।'

'তাহলে আমার কাছে থাক দু'দিন। মায়ে মেয়েতে আমার ঘরে কুলিয়ে যাবে। একসঙ্গেই ফিরব।'

অনিরুদ্ধ আপত্তি করলেন না। আসলে অনিরুদ্ধও জানতেন না —মালতী দেবীকে দিয়ে ইলোরাই কথাটা বলিয়েছিল।

ইলোরা হঠাৎ কেন বলাল?

* * * *

অনিরুদ্ধ চলে গেলেন। আসার কথা তাঁর গাড়ির আরো চারদিন বাদে। এরই মধ্যে একদিন গেল আত্মীয় ভোজনে।

তার পরদিন—অনন্তের এতকালের দাসী কেলোর মা—যে কিনা এতদিন প্রায় সারা বাড়ির কাজ একা মাথায় করে রেখেছে আর হাপুস নয়নে কেঁদে গেছে, সে এসে একটা চাবির গোছা ঝনাৎ করে অনন্তের ফেলে যাওয়া তক্তপোশের উপর রাখল। 'দাদাবাবু! এই হচ্ছে বাবুর চাবি—এটা এই তোরঙ্গের—এটা ঐ বাক্সের—আর ওটা ঐ ঢাকনা দেওয়া চুপড়ির মতো দেখছ, বেতের বুনোনি—ওটার। বুঝে নিও গো সব।'

সাড়ে বাইশটাকা পেনসন পাওয়া অনন্ত মাষ্টারের সম্পত্তির বহর অনেক বটে। হাসল জয়ন্ত—তারপর নজর পড়ল দেওয়ালে টাঙানো একটা ময়লা হয়ে যাওয়া ফতুয়ার দিকে! কেলোর মারও নজর গেছে ওদিকে। হাসল সেও। বলল, 'বাবু ওটাকে কোনদিন কাচতে তো দিতেনই না—হাত নিজেও দিতেন না—খালি চলে যাওয়ার আগের দিনে'—আরেক প্রস্থ কেঁদে নিল কেলোর মা। 'আগের দিন আমাকে কোনরকমে বললেন, "খোকা এলে ওটা তাকে দিস। নইলে আমার সঙ্গেই পুড়িয়ে ফেলতে বলিস।" তা দেখ বাবু কোন ধনসম্পত্তি ওর মধ্যে তোমার জ্যাঠা রেখে গেছে! আমি যাই। ওপাশে রাজ্যির কাজ পড়ে আছে।'

কেলোর মা অনেকক্ষণ চলে গেছে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে জয়ন্ত জীর্ণ ফতুয়াটার দিকে—হাত দিতেও কেমন যেন গায়ের মধ্যে শিরশির করছে! কি একটা ভাব! জয়ন্ত উঠল—আস্তে আস্তে ফতুয়ার কাছে গেছে—একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে—

'উঁ হুঁ।—সরে আসুন তো আগে, খাটে যে ভাবে বসেছিলেন সে ভাবে বসুন ফতুয়াটার দিকে তাকিয়ে আরেকবার।' জয়ন্ত প্রায় বিষম খায় আর কি! ইলোরার হাতে সেই ক্যামেরা। জয়ন্ত কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ইলোরার হাতের ইঙ্গিতে থেমে গেল। বসেই পড়ল খাটে—যেমন যেমন বলেছে মেয়েটা।

'এবার যা করছিলেন করুন নিজের ইচ্ছে মতো।' ইলোরার গলা।

জয়ন্ত তবু আরেকটু বসেই রইল। তারপর এগিয়ে গেল ফতুয়াটার দিকে—যথাপূর্ব হাত বাড়িয়ে আস্তে করে নামিয়ে আনল ফতুয়াটা। খুবই জীর্ণ, সাধারণ কাপড়েরও—তাই ধীরে ধীরে সেটাকে নেড়ে চেড়ে দেখতে থাকল সে। না। কোথাও কিছু নেই। কোথাও !

কিন্তু এ জায়গাটা শক্ত শক্ত লাগছে কেন। উল্টে ফেলল ফতুয়াটা। ভিতর দিকে সেলাই করা পকেট মতো একটা। চারপাশটাই সেলাই। তারমধ্যে খসখস করছে কিছু একটা। সুতোর সেলাই, খুব পটু হাতে করা নয়। কিছু একটা পেলে কেটে ফেলতে অসুবিধে হত না। কিন্তু হাতের কাছে পাওয়াই বা যায় কি ? অগত্যা দাঁতের সাহায্য নিল জয়ন্ত। কেটে ফেলল সুতোর একটা জায়গা—সেলাই আলগা হয়ে গেল—খুলে গেল পকেট, বেরিয়ে এল একটা সাদা খাম। বন্ধ। উপরে লেখা 'শ্রীমান জয়ন্ত আদিত্য—স্নেহাস্পদেষু'

'খুলে ফেলুন' নির্দেশটা ইলোরার, না বামাকণ্ঠে দৈববাণী !

ধীরে ধীরে সাবধানে একপাশ ছিঁড়ল জয়ন্ত। খাম থেকে বেরিয়ে এল একটা চিঠি।

"পরমাশিস্ ভাজনেষু,

কল্যাণীয় জয়ন্ত; হয়তো আমার জীবৎ কালে তোমাকে দেখা আমার ভাগ্যে নাই। আমার ডাক আসিতেছে বুঝিতে পারিতেছি। শরীর আর টানিতে পারিতেছে না। যে কোনদিনই অন্যলোকের দিকে চলিয়া যাইতে হইবে। সাক্ষাৎ হইলে এ বংশের ইতিহাস তোমাকে শুনাইতাম—জানিনা তোমার ভাল লাগিত কি না। যাহাই হউক—এ কথা আমার পক্ষ হইতে তোমাকে জানান একান্ত কর্তব্য বলিয়াই সংক্ষেপে এ পত্র লিখিতেছি। আমাদের এই বংশ আদিত্য বংশ। দীর্ঘ তেরশত বৎসরের পুরাতন রাজবংশ। এই জগৎপুরে আমাদের বসবাস মাত্র তিনশত বৎসর। ইহার পূর্বে আমরা ছিলাম বর্তমান বীরভূমের নিকট। তাহারও পূর্বে আমাদের নিবাস ছিল সহস্র বৎসর পূর্বে আমাদের রাজত্বের রাজধানীতেই। সে সময়ে আদিত্য বংশ বঙ্গের গৌরব। ইচ্ছা থাকিলে অনুসন্ধান কর। এমন কিছু খুঁজিয়া পাইতেও পার যাহাতে লুপ্ত গৌরব উদ্ধার হইতে পারে।

আমি পারি নাই। সম্ভব ছিল না। তোমার পিতার ইহাতে বিশ্বাস ছিল না বলিয়াই কিছু বলি নাই। তোমাকেও তাই ইতিহাসের ইঙ্গিত মাত্র দিয়া গেলাম।

গৌড়ভুজঙ্গের আশীর্বাদ তোমার উপর বর্ষিত হউক।

আং—

অনন্ত আদিত্য।"

স্তম্ভিত জয়ন্ত—এ আবার কোন রহস্য! গৌড়ভুজঙ্গ! কে তিনি?

চিঠিটা হাতে দাঁড়িয়েই থাকত হয়তো।

'খুঁজবেন না পুরনো রহস্য?' ইলোরার গলাটা পিছন থেকে।

চিঠিটা নিয়ে ও দাঁড়িয়েছিল জ্যাঠামশায়ের ভাঙা তক্তপোশের সামনে। কখন যে ইলোরা নিঃশব্দে পিছনে এসেছে কে জানে!

প্রশ্নটাই বুঝিয়ে দিল যে ও চিঠিটাও পড়েছে। ছবিও তুলে নিয়েছে কিনা কে জানে।

'খুঁজব বলছেন?'

'নিশ্চয়।'

জয়ন্ত চিঠিটা পকেটে ঢোকাল। তারপর চলল একের পর এক তোরঙ্গ, বাক্স খোঁজা। হয়ে গেল। বেরোবার মধ্যে বেরোল মৃত জ্যাঠাইমার কিছু পোকায় কাটা শাড়ি, বহুকালের পুরনো একটা বেনারসীর টুকরো। আর হাতে আঁকা ছোট একটা অয়েল পেন্টিং। আবছা হয়ে গেছে। তবু মৃত জ্যাঠামশায়ের মুখ তাকে চিনিয়ে দিল এটা অনন্ত আদিত্যের ছবি। বেশ কম বয়েসের ছবি। তলায় শিল্পীর নামও লেখা আছে—বিকাশ। ছবির তলায় সুন্দর করে লেখা আছে অনন্ত আদিত্য।

হয়তো কোন ছাত্র ভালোবেসে ছবিটা এঁকে দিয়েছিল। তখনও হয়তো অনন্ত আদিত্যই ব্যবহার করতেন—বা দু'-একজন যেমন জানে বিকাশও হয়তো জানত—ওঁরা আদিত্য বংশের লোক।

ছবিটা হাতে তুলে নিল ইলোরা—ভাল করে দেখল। তারপর সযত্নে ঐ তোরঙ্গেরই তলা থেকে বার করা একটা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে মুড়ে রাখল।

কিন্তু জয়ন্ত মনে মনে একটু ক্ষেপেই গেল। এত ঘেমে নেয়ে সে বাক্স প্যাঁটরা খুঁজছে—একটু সাহায্য করলে পারে, তা নয় ক্যামেরাটি কাঁধে তিনি যেন সিনেমার ক্যামেরাম্যান এই ভঙ্গিতে ঘরের এদিকে ওদিক করে বেড়াচ্ছেন।

এই সময়ে মালতী দেবী ঢুকলেন ঘরে। 'দেখি-দেখি—যাক অনেক ছেঁড়া কাপড় পাওয়া গেছে, কাঁথা বানানো যাবে। আর এই বেনারসীটা এতে নিশ্চয় জরির সঙ্গে সোনা আছে—অনেক দাম এর বুঝলে ইলোরা।'

'তবে আর কি ? ভাস্থরের কাছ থেকে অনেক সোনা পেয়েছ—বড়লোক হয়ে গেলে তুমি !' জয়ন্তের গলা।

'আহা! ছেলের যেমন কথা! এ দিয়ে অনেক বাসন কেনা যাবে রে—সংসারের কোন খবর তো রাখ না।'

'রেখে আর লাভ নেই। তুমি বাসন কেন—আর কি কেন—ও বাবা তোমার সম্পত্তি। তুমিই নাও।'

'নেবই তো।' বলে সব গুছিয়ে তিনি নিয়ে চললেন তাঁর ঘরে। 'তা তোরা এবার চানটান করে নে—না। বেলা তো অনেক হল।' বলতে বলতে তিনি ঘরের বাইরে।

'তাহলে ?' ক্লান্ত হয়ে পিছনে হাত দু'টোর উপর ভর করে জয়ন্ত কাত হল মেঝেতে। "এমন কিছু খুজিয়া পাইতেও পার—" তা এমনটা বলে তো সবেধন নীলমণি ঐ ছবি। ও ধুয়ে সহস্র নয়, বছর চল্লিশের আগের ধুলো কিছু পাওয়া যেতে পারে। সত্যি এতো আষাঢ়ে গপ্পোও আমাদের দেশে চলে—।'

'এখনও ঐ বেতের ঝুড়িটা দেখা হয় নি'। ইলোরার গলায় তখনও আশা।

'দেখতে হয় আপনি দেখুন—এই যে চাবি।'

'বাঃ আপনার জিনিস আমি হাত দেব কেন ?'

'বলুন পরিশ্রম করার ইচ্ছে নেই।'

'অধিকার ভঙ্গের দায়ে পড়ে যাব যে—পরিশ্রমে ভয় পাব কেন ?'

'তাও তো বটে ! আপনি তো আবার মাউন্টেনীয়ার, ঘোড়সওয়ার, সাঁতারু, বন্দুকবাজ, পাইলট—'

'এ্যাই ! পাইলট আমি নই। কিন্তু এরকম ঝগড়া করছেন কেন ?'

'ধ্যাৎ ! আমার আর ভালো লাগছে না। খিদেও পেয়েছে।'

'এই ঝুড়িটা দেখলেই তো কাজ শেষ হয়—'

'তা কি করে হবে ? গল্পে পড়েন নি—দেওয়ালের মাঝে ফাঁক-ফোঁকর থাকে—খাটের মধ্যে গর্ত থাকে, সেসব খুঁজেপেতেও তো দেখতে

হবে। হয়তো বা একটা সুড়ঙ্গই আছে মাটির তলায় যা দিয়ে হাঁটলে সহস্র বৎসর পূর্বের আমার রাজধানীতে পৌঁছে যাব। যত্তসব!'

'আচ্ছা বাবা—আচ্ছা, দিন চাবিটা।—আর গজগজ করতে হবে না।'

জয়ন্ত চাবি চিনিয়ে দিয়েই খালাস। ইলোরা বেতের চুপড়িটার কাছে গিয়ে বলল 'চুপড়িটা দেখেছেন কেমন আশ্চর্য ধরনের।'

আসলে ওদের দোষ কি? একে এককালে বলা হত প্যাঁটরা। খুবই প্রচলন ছিল বাংলায় এর এক সময়ে। তার জায়গা দখল করেছে এখন টিনের—তারপর স্টিলের ট্রাঙ্ক—আলমারি।

তা সেই নাম না জানা চুপড়ির তালা আর খোলে না। তার মানে অনন্তবাবু এটি খুলতেনই না। ইলোরাও গলদঘর্ম।

জয়ন্ত বসে বসে দেখছে। পকেট থেকে একটা দেশী কমদামী সিগারেট বার করে দেশলাই দিয়ে ধরাতে যাবে—এ কদিনের পরিচয়ে ইলোরার সামনে সে ধূমপান করে, কিন্তু কেমন যেন লজ্জায় পড়ে বিড়িটা বন্ধ করেছে। খরচায় এই সিগারেটও তার পক্ষে কুলোন সম্ভব নয়—তাই কম খাচ্ছে। নবনগর গিয়ে আবার ধরা যাবে বিড়ি, মনে মনে ভেবে রেখেছে সে। আর এ কদিন বয়ঃজ্যেষ্ঠ গ্রামবাসীদের ঘনঘন আনা-গোনায় ধূমপান তো এমনিই কম করতে হয়েছে তাকে। জয়ন্তের তালুক পাওয়া যখন হয়ে উঠল না তখন হিসেব করেই তাকে চলতে হবে। মনে মনে হেসে উঠল জয়ন্ত। 'কিন্তু হলটা কি? পারলেন না?'

ইলোরা মাথা নাড়ে—'না। পারছি না।'

'দেখি—সেই আমাকে উঠিয়েই ছাড়বেন।'

জয়ন্ত ভালো করে লক্ষ্য করল তালাটা—এপাশ ওপাশ দেখল। আশ্চর্য। চাবির রিং-এর যে চাবিটা এতে লাগার কথা সেটা লাগছে, ঘুরছেও—কিন্তু তালাটা খুলছে না তো।

চাবিগুলো আবার দেখল জয়ন্ত। একটা বাক্সের, একটা তোরঙ্গের

একটা এই চুপড়ির বলেছে কেলোর মা। কিন্তু রিং-এ আরও একটা চাবি রয়েছে—এটাই কি ?

লাগাল সেটা—ঢোকেই না তালার গর্তে !

তালাটাকে ওল্টাল। পিছনে—না সেখানে কোন গর্ত তো নেই। পাশে—উঁহু ! সেখানেও নয়। কিন্তু—কিন্তু এটা কি। চুপড়ির তুলনায় তালাটা একটু বড়। এবং একটু আশ্চর্য ধরনেরও বটে। ওপরে ব্যাঁকানো লোহার যে শিকের টুকরোটা তালার ভিতরে দু'দিকে ঢোকানো থাকে—সেটা কেমন চ্যাপটা মতো—আর তারই ঠিক মধ্য মাথায়— ! একটা ছ্যাঁদা। জয়ন্ত ভাবল। তারপর তার মাথায় একটু বুদ্ধির ঝলক ! প্রথম চাবিটা তলার গর্তে দিয়ে ঘুরিয়ে দ্বিতীয় চাবিটা উপরের গর্তে দিতেই খট একটা আওয়াজ। তালাটা দু' অংশে ভাগ হয়ে তলার অংশটা মাটিতে পড়ে গেল, আংটার মতো অংশটা ঝুলে রইল চুপড়ির আংটার সঙ্গে। দু'জনে তাকাল দু'জনের দিকে। রহস্য। এ রকম একটা তালা—এ রকম একটা বেতের ঝুড়িতে। আশ্চর্য।

জয়ন্ত চুপড়িটা খুলতে যাবে—ইলোরা নিঃশব্দে উঠে দরজায় ছিটকিনি তুলে দিল।

জয়ন্ত আবার তাকাল। 'দরজাটা বন্ধ করলেন কেন ?' চোখে তার এই জিজ্ঞাসাটাই যেন ফুটে উঠল।

প্রায় ফিসফিস করেই জবাব দিল ইলোরা, 'দেখছেন না তালাটা কি রকম ! পেতেও তো পারেন এর মধ্যে বিশেষ কিছু।'

জয়ন্তের কেমন অবশ অবশ ভাব। না জানি কি বেরোবে এর মধ্যে থেকে। ডালাটা তুলল। একটা গরম কোট। সাবধানে তুলতে গিয়ে জয়ন্ত লক্ষ্য করল বাইরে থেকে ঝুড়িটা বেতের হলে কি হবে ভিতরে পাতলা লোহা দিয়ে মোড়া ; চুপড়িটা ইলোরাও দেখল। এত সাবধানতা কেন ? তবে কি সত্যিই কিছু আছে ?

কোট দেখলেই বোঝা যায় অনন্তের। অক্ষতই প্রায়। কেননা

পোড়া লঙ্কা, কালোজিরে—ন্যাপথলিন—গ্যামাক্সিন পৃথিবীতে কাপড়-কাটা-পোকা মারার যত ওষুধ আছে সব ছড়ানো ওর মধ্যে। কিন্তু ঐ কোটটা তুলতেই—আরেকটা কোট; সাবধানে—অতি সাবধানেই তুলল জয়ন্ত।

ভাঁজে ভাঁজে কেটে যাওয়ার মতো অবস্থা এই কোটের। কিন্তু এ কি কাপড়! লাল সিল্ক জাতীয় কিছু! দু'হাত দিয়ে যত্ন করে তুলে নিল জয়ন্ত কোটটা। বুকের যে অংশটা সামনের দিকে ভাঁজে পড়েছে সেখানেও জরির কাজ। গলার কাছটা কলারের মতো—সেখানেও ঐ জরির কাজ। জয়ন্তের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে—এ কোট অনন্তের! অনন্ত তো সাধারণ উচ্চতার—ভাঁজ খুলতে খুলতে কোটটার ঝুলটুকু যেখানে পৌঁছেছে, একমাত্র গায়ে হলে হতে পারে—কার?

জয়ন্ত নিজের মনেই চমকাল। কিন্তু চমকালেও কথাটা ঠিক। আর ইলোরাই বলল সে কথাটা—গলার স্বরে তখনও ফিসফিসানি—'কোটটা আপনার জ্যাঠামশায়ের নয়। উনি তো এতো লম্বা ছিলেন না। অন্তত যা শুনেছি। এ কোট যিনি পরতেন তিনি আপনার মতো লম্বা। দেখে মনে হয় এটা যেন আপনারই।'

জয়ন্ত কথাটাকে মেনে নিল—বিস্ময় তার গলাতেও। 'দেখেছেন কি রকম জ্বলজ্বলে জরির কাজ সারা গায়ে।' কোটটা আস্তে আস্তে খুলে ফেলেছে জয়ন্ত। না যতটা ঝুরঝুরে হবে ভেবেছিল তা নয়।

ইলোরার ক্যামেরা চলছে। কেবল মুখে বলল—'মনে হচ্ছে জরি নয়—একেবারে—'

এই সময়ে দরজায় ধাক্কা!

দু'জনে আবার দু'জনের দিকে তাকায়। কিন্তু না—অভয় কণ্ঠ শোনা গেল। 'আরে আমি অনিরুদ্ধ—জয়ন্ত দরজা খোল।' জয়ন্ত দরজা খুলবে কি—তখনও সে ঐ ভাবে হাত ছড়িয়ে দিয়ে কোটটাকে নিজের গায়ের সঙ্গে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ইলোরাই খুলল দরজা।

অনিরুদ্ধ ঢুকলেন! এক ঝলক দেখলেন। বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ মানুষ! কোন কথা না বলে, দরজায় আবার ছিটকিনি তুলে দিলেন।

'আর কিছু পেলে?' প্রশ্নটা অনিরুদ্ধের।

জয়ন্ত সাবধানে কোটটাকে অনন্তের তক্তপোশে বিছিয়ে দিল। পকেট থেকে চিঠিটা বার করে দিল। অনিরুদ্ধ পড়ে দেখলেন। তারপর নিজের পকেটে ঢোকালেন সেটা। কোন কথাই নেই তাঁর মুখে। দ্রুত এসে অনন্তের গরম কোটটা উলটে পালটে দেখলন। তারপর ঐ রাজকীয় কোটটার পকেট-টকেটগুলো। একটু যেন তাড়াতাড়িই করছেন অনিরুদ্ধ। দেখলেন সাধারণ ভাবে। 'না হে কিছু আর এতে নেই। পরে ভালো করে দেখতে হবে। এখন ওটাকে ভাঁজ কর।'

জয়ন্ত করল। সে যেন যন্ত্রচালিত। কিন্তু হঠাৎই তার মনে হল অনিরুদ্ধ আজ কেন? তাঁর তো বাইরে যাওয়ার কথা কোথায়।

কোট ভাঁজ করতেই—অনিরুদ্ধ বললেন, 'যেমন ছিল তেমন ভাবেই রাখ। আর শোন আজই তোমাদের নবনগর ফিরতে হবে।'

'কেন?' প্রশ্নটা ইলোরার। জয়ন্ত তখন আবারও চুপড়ির জিনিস চুপড়িতে রাখছে।

'আপনার যেন বাইরে যাওয়ার কথা ছিল', বলল জয়ন্ত একই কায়দায় চুপড়ির তালা বন্ধ করতে করতে। তীক্ষ্ণ চোখে সেটার দিকে নজর রাখতে রাখতে অনিরুদ্ধ বললেন—'তোমার জন্যই তো যাওয়া হল না।'

'কেন?'

'তোমার দলের ছেলেরা একটা মিটিং করতে গিয়ে বিপক্ষ দলের সঙ্গে মারামারি বাধিয়ে ফেলেছে। বাধিয়েছে শুধু না—বিপক্ষ দলের দু'জন হাসপাতালে। তোমার দলের দশজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তোমাকে খুঁজছে কেওড়াতলির ও. সি.।'

'কিন্তু আমি তো এখানে!'

'তাতে কিছু যাচ্ছে আসছে না। আমি উকিলের সঙ্গে কথা

বলেছি। তাঁর মতে তোমার সারেণ্ডার করা দরকার সর্বাগ্রে। নইলে কেওড়াতলির ও. সি. যদি এখানে এসে তোমাকে গ্রেপ্তার করে সেটা তোমার সম্মানে আরও বাধবে।'

দু'ঘণ্টার মধ্যে বিলি ব্যবস্থা হল সব। হরলাল সাগ্রহে বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব নিল, কেলোর মা নিল গাভীটি যত্নের এবং ঝাঁটপাট দেওয়ার।

অনিরুদ্ধই ভরসা দিলেন—মাসে মাসে জয়ন্ত আসবে একবার করে। না হলেও হাত-খরচা একটা নিশ্চয় পাঠাবে।

জয়ন্ত গিলল কথাটা। এখন তার মাথায় একটাই চিন্তা কেওড়াতলি থানা।

গাড়িতে যেতে যেতে পাশে বসা জয়ন্তকে বললেন অনিরুদ্ধ—, '—তোমার এই চিঠি এবং চুপড়ি এখন আমার বাড়িতে থাক—পুলিশী হাঙ্গামাটা মিটুক আগে—'

'আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলাম স্যার। বাড়িতে যদি হামলা করে তবে ঐ জরি দেওয়া কোটটাকেই হয়তো সোনা বলে মনে করে—'

'মনে করার মধ্যে কোন ভুল নেই জয়ন্ত। ওটা আগাগোড়া সোনা—খাঁটি সোনার কাজ!'

আট

সামনের টেবিলে হাতে ধরা কাঠের রুলটাকে তিনবার ঠুকল কেওড়াতলির থানা ও. সি। খুব খুশি। 'বারে বারে ঘুঘু তুমি ধান খেয়ে যাও—হুঁ হুঁ বাবা—এবার। এবার তোমায় বোঝাব আমি আমার নামও রতন পাকড়াশি। শুধু শুধু কেওড়াতলি থানায় আমি এসে বসি নি। এই বার—এই বার যাবে কোথায়।'

ঠোঁটের ডগায় একটা বিদ্রূপের হাসি এনে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল

রতন পাকড়াশি। 'এবার তো শ্রীল শ্রীযুক্ত জয়ন্তাদিত্য রায় মহাশয়কে শিকের ভিতরটায় বেড়িয়ে আসতে হবে।'

'কিন্তু আমি তো জ্যাঠার শ্রাদ্ধে ব্যস্ত ছিলাম!'

'মারামারি বাধিয়ে—বিপক্ষ দলের ছেলেদের খুন করার বুদ্ধি দিয়ে নেতারা ওরকম অনেক জ্যাঠারই শ্রাদ্ধ করে মাথা না মুড়িয়ে!'

জয়ন্ত এমনিতে এসব ব্যাপারে মাথা ঠাণ্ডাই রাখে চিরকাল। কিন্তু এখন মাথা গরম করার যথেষ্ট কারণ থাকলেও অনিরুদ্ধ বোসের তোতাপাখি হয়ে গেছে সে। অনিরুদ্ধ বারবার করে বলে দিয়েছেন 'একদম কোন তর্ক করবে না। আমি যা ব্যবস্থা করার করছি।'

জয়ন্ত তবু বলল, 'সে তো আপনি জগৎপুরের পুলিশের কাছে খবর নিলেই জানতে পারবেন।'

'কি করব আর না করব—সে পরামর্শ আর নাই বা দিলেন জয়ন্ত বাবু। ওটা আপনার দলের ছেলেদের জন্যই তোলা থাক। আপাতত খুনের প্রচেষ্টার অপরাধে কিছুদিন ঘানি তো টেনে আসুন।'

অগত্যা হাজতবাস। সরকারী উকিলকে রতন পাকড়াশি ভালো মন্তরই পড়িয়েছিল, যদিও জগৎপুর থানার রিপোর্ট আনাবার ব্যবস্থা করেছিলেন অনিরুদ্ধ বোস। সেটা পেয়েও রতন পাকড়াশি সরকারী উকিল শ্যাম ঘোষালকে ধরে পড়ল—'জামিন যেন কোনমতেই না পায় স্যার। তাহলে আর আমাকে কেওড়াতলিতে চাকরি করে খেতে হবে না। এই পালের গোদাটা পাক্কা বদমায়েস।'

ঘোষাল বাবুর নেকনজরটা পাকড়াশি একটু বেশীই পায়। ঘোষাল তাকে ভরসা দিলেন। 'কিন্তু তিনদিনের মাথায় অন্তত কোর্টে একবার তো তুলতেই হবে। চব্বিশ ঘণ্টাতেই তোলার কথা—তবু ছুতো নাতায় ওটা না হয় বাহাত্তর ঘণ্টা করা গেল।'

'হ্যাঁ তা তুলব। কিন্তু স্যার ঐ জামিন টা—' রতনের অনুনয়।

'ঠিক আছে—ঠিক আছে—সে আপনাকে আর বলতে হবে না।

শ্যাম ঘোষাল কথা দিলে তার মুঠো ফস্কে পালাবে এমন আসামী এ পর্যন্ত লক্ষ্মণপুর কোর্টে ওঠেনি রতন বাবু।'

রতন বাবু গোঁফে তা দিতে দিতে জীপে উঠলেন।

ঘোষালের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল।

তিনদিন বাদে কোর্টে এসে কিন্তু রতন পাকড়াশি অবাক। জয়ন্ত জামিন পাবে—জানালেন শ্যাম ঘোষাল।

'বলেন কি স্যার? আপনাকে যে এতো করে বললাম!'

'তা আপনি কি বলতে চান আমি আমার এই সরকারী চাকরিটা খোয়াব?'

'কেন স্যার?' রতন প্রয়োজনে বোধহয় শ্যামের পা-দু'টোই ধরে।

'ব্যারিষ্টার ঘোষের নাম শুনেছেন?'

'কোন ব্যারিষ্টার ঘোষ? যিনি?'

'হ্যাঁ যিনি দু'-বার আইনমন্ত্রী ছিলেন। যিনি একই দিনে সুপ্রিম কোর্টে একটা, ক'লকাতা হাইকোর্টে একটা, পাটনা হাইকোর্টে আরেকটা কেস করেন! যাঁর জুনিয়ররা সব হাইকোর্টের জজ হয়ে বসে আছেন—তিনি আসছেন। আপনার ঐ আসামীর হয়ে দাঁড়াতে। আমাকে স্নেহই করেন তিনি—একটা ফোনও করেছিলেন। জগৎপুরের রিপোর্টের উপর জামিন না দিয়ে লক্ষ্মণপুরের ছোট জজসাহেবও পার পাবেন না। এঁরা তো সব মশাই ওঁর ছাত্তর।' বলে গটগট করে ঘোষাল চলে গেলেন সওয়াল করতে।

আর রতন পাকড়াশি! সাব ইনস্পেক্টর মিত্তিরের হাতে ভার দিয়ে মন মরা হয়ে থানায় ফিরল।

ঘণ্টাখানেক বাদে—ব্যারিস্টার ঘোষ গাড়িতে উঠতে উঠতে অনিরুদ্ধকে চাপা গলায় খালি বললেন, 'হে ঐতিহাসিক ভূপর্যটক—এবার কোথায় পাড়ি দেবে বলতো?'

'জানাব—জানাব। যদি কোথাও যাই—তোমাকে না জানিয়ে যাব না। আর গেলে তো ঐ ছেলেটিও আমার সঙ্গেই যাবে এবার।'

'তার মানে তুমি আমার কাঁধে রতন পাকড়াশিকে চাপিয়ে দেশ আবিষ্কারে যাচ্ছ?—বেশ আছ! যাইহোক যোগাযোগ কর কিন্তু!'

'নিজের দরকারেই করতে হবে হে ব্যারিস্টার সাহেব। নিজের স্বার্থেই।'

দু'জনে দু'জনের গাড়িতে উঠলেন। এম. এ. পড়ার সময়ের বন্ধুত্বটা এখনও গভীরই আছে দু'জনের।

সেদিনই সন্ধ্যে বেলা।

অনিরুদ্ধ বোসের বাড়ি।

ভাগ্যিস চুপড়ি এবং চিঠিটা অনিরুদ্ধের বাড়ি ছিল। রতন পাকড়াশি জয়ন্ত নিজে থেকে থানায় ধরা দেওয়া সত্ত্বেও বাড়িতে সার্চটা ঠিকই করেছিল।

তা আজ সন্ধ্যে বেলা আবার বেরোল ঐ কোট। পাঁতি পাঁতি করে খুঁজছেন অনিরুদ্ধ নিজেই। না কোন কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু আর কি খুঁজছেন তিনি—জয়ন্ত না জিজ্ঞাসা করে পারল না।

'অর্ধেক পথ এসে তো থেমে থাকা যায় না।'

'কিসের অর্ধেক পথ?'

'কণ্ঠহারের অর্ধ।'

'কণ্ঠহারের অর্ধ!'—

নতুন নতুন শব্দ। কয়েকদিন ধরে কেবল নতুন কথা এবং শব্দ। আদিত্য—আদিত্য থেকে নরেন্দ্রাদিত্য—গৌড়ভুজঙ্গ—এখন কণ্ঠহার।

না। আর পারছে না জয়ন্ত। নেহাত অনিরুদ্ধ বোসের উপকার ভুলবার নয়—না হলে সত্যি জয়ন্ত ছুট লাগাত।

লাল কোটটা তখন ইলোরার হাতে। সেও তন্নতন্ন করে খুঁজছে। না সেও পারল না।

হাত ঘুরে এবার জয়ন্ত। জয়ন্ত বিশেষ চেষ্টা করল না। বিরক্তিতে তার মাথাটা গরম হয়ে যাচ্ছে। 'এ আরেক হতচ্ছাড়া জিনিস—' রাগে বিড়বিড় করতে করতে কোটটা যে বহু পুরনো সেটা ভুলে কলারটা ধরে একটা মোচড় মেরে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়েই—

'শীগ্‌গির! ইলোরা একটা ব্লেড বা ছুরি কাঁচি কিছু আনতো।' সম্বোধন ভুলে গিয়ে—'তুমিই' বলে ফেলল উত্তেজনায়।

অন্য দু'জনও সেদিকে নজর দিলেন না। উত্তেজনাটা তাঁদেরও স্পর্শ করল। ইলোরা মুহূর্তেই একটা ব্লেড এনে দিল। জয়ন্ত ব্লেডটা নিয়ে জামার কলারটার উপর খুব সাবধানে চিরতে থাকল—একটা দম বন্ধ করা পরিবেশ।

ধীরে ধীরে কলারটা খুলে গেল। আর বেরিয়ে এল একটা—

অনিরুদ্ধ চিৎকার করে উঠলেন। ইলোরা একটা লাফই দিল বোধহয়, মুহূর্তে তার হাতে সোফা থেকে ক্যামেরাটা উঠে এল। জয়ন্ত তখন অর্ধচেতন অবস্থায় কলারের ভিতর থেকে যেটা বার করে আনল —তাতে আলো পড়ে জ্বলে উঠল তেরটা ছোট সূর্য।

'অর্ধহার। গৌড়ভুজঙ্গের অর্ধহার!' অনিরুদ্ধের উত্তেজিত অথচ চাপা কণ্ঠ!

একটা হার। চেহারাটা অনেকটা হাত-ঘড়ির মোটা চেনের মতো। একটা করে সোনার কারুকাজ করা দু'ইঞ্চি চওড়া—দু'ইঞ্চি লম্বা যথেষ্ট পুরু অংশ, তারপরই একটা পদ্মরাগ মণি। অদ্ভুত উপায়ে আংটার মতো করে লাগানো পরস্পরের সঙ্গে, কিন্তু খোলার কোন উপায় নেই। আর এমনভাবে তৈরি, এটা যে হার এবং খানিকটা অর্ধ-চন্দ্রাকার সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। জামার কলারের গঠনটাও তাই সেইভাবেই গলার দিকে বাঁকিয়ে নামানো ছিল। হারটার একদিকে একটা ইংরেজী 'এস' অক্ষরের মতো আংটা। বেশ বোঝা যায় হারটা গলায় আটকাবার জন্যই তৈরি। তারপর একটা সোনার চতুস্কোণ, তারপর একটা পদ্মরাগ। তারপর আরেকটা সোনার—এইভাবে

বারটা পদ্মরাগ মণি। কিন্তু তের নম্বরের মণির আকারটা অন্য বারটার থেকে অন্য রকম। আয়তনে বারটার থেকে অনেক বড়। এবং তলায় সোনার পাত। পাশের দিকে অতি সূক্ষ্ম একটা আংটার মতো। মণিটাকে যেন কেউ করাত দিয়ে অর্ধেক করেছে। ঐ আংটা দিয়ে লাগালে বাকী অর্ধেকটা নিয়ে একটা পূর্ণ মণি হবে—অথবা বলা যায় আরেকটা অর্ধহার ঐভাবে যুক্ত হবে।

বিস্ময়ের ঘোর কাটবার পর ধীরে ধীরে হারটার বিশ্লেষণ করলেন অনিরুদ্ধ।

জয়ন্ত যেন ঘোরের মধ্যে পড়েছে। গায়ে যেন তার খুবই জ্বর। আস্তে আস্তে কথা বলল যখন, তখন স্বরটা ক্ষীণ—'বাকী অর্ধেক?'

'আছে।'

'কোথায়?'

'তার আগে আমাদের দেখতে হবে আরও কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় কি না!'

'আরও?'

'নিশ্চয়।'

অনিরুদ্ধ একটা বিরাট আতস কাঁচ নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন হারটার। অনেক খাটিয়েছে এতদিন সবাইকে। তাই এবার আর বেশী পরিশ্রম করতে হল না। ঐ তের নম্বর অর্ধ পদ্মরাগের পিছনের সোনার পাতের পাশেই পাওয়া গেল একটা সূক্ষ্ম গর্ত। একটা আলপিন দিয়ে চাপ দিতেই খুলে গেল একটা ঢাকনা। তার ভিতর থেকে সূক্ষ্ম সন্না দিয়ে অনিরুদ্ধ বার করে আনলেন একটা হলদে কাগজ।

মুখে বললেন, 'তুলোট—জান নিশ্চয়।'

'হ্যাঁ। বহু পুরনো কালের কাগজ।' জয়ন্তের উত্তর।

কাগজটা সাবধানে এগিয়ে দিলেন তিনি জয়ন্তের দিকে—'দেখ তোমার পূর্বপুরুষরা কি লিখেছেন?'

জয়ন্ত কাগজটা সাবধানে নিল। লেখাটা বাংলা—কিন্তু হরফগুলো অনেকটা পরিচিত—অনেকটা অপরিচিত।

'অক্ষরগুলো ?' জয়ন্তের লজ্জা মিশ্রিত কণ্ঠ।

'পুরনো বাংলা তো। পারবে একটু চেষ্টা কর, পারবে পড়তে।'

ইলোরার ক্যামেরা এক জায়গায় বসানো। জয়ন্ত জানে না ক্যামেরা তার কাজ করে চলেছে। সবটাই এখন— যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত।

নয়

শেষ পর্যন্ত অনিরুদ্ধকেই পড়তে হল। পুরনো বাংলা হরফ পড়তে গিয়ে জয়ন্ত আটকে যাচ্ছিল বারবার। আসলে যতটা না অজ্ঞতা তার থেকেও বেশী তার স্নায়ুর উত্তেজনা।

"আমি আনন্দাদিত্য এই লিপি প্রেরণ করিতেছি আমার ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের উদ্দেশে। তৎপূর্বে আমার বংশ পরিচয় লিপিবদ্ধ করি।

গৌড় মগধেশ্বর রাজাধিরাজ শশাঙ্ক নরেন্দ্রাদিত্যের আমি অধস্তন অষ্টম পুরুষ। নরেন্দ্রাদিত্যের এক ভ্রাতুষ্পুত্র মহেন্দ্রাদিত্যের আমি বংশধর। মহেন্দ্রাদিত্যের পিতা ছিলেন মাধবাদিত্য। মহারাজ মানবাদিত্যের সঙ্গে তাঁর অনুজ মাধবাদিত্যও বীরলোকে গমন করেন সম্রাট হর্ষবর্ধন ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি ভাস্করবর্মার মিলিত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে।

তৎপরে মহেন্দ্রাদিত্য ও তাঁহার বংশধররা গৌড়ের এক প্রান্তভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাল আমাদিগকে গ্রাস করিতেছে। ক্রমে-ক্রমে আমরা উদরান্নের জন্য হীন হইতে হীনতর বৃত্তির পথে অগ্রসর হইতেছি।

বর্তমানে আমাদের অধীনে যে ভূখণ্ড আছে তাহা যৎসামান্য। তবে অধুনাকাল অবধি নরেন্দ্রাদিত্যের অনুগত কয়েকশত প্রজা আমাদের উপরই নির্ভর করিয়া আছে। ইহা দেখিয়াই আমার অনুজ

শ্রীমান ললিতাদিত্য তাঁহার পঁচিশ বৎসর বয়সে মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে পঞ্চাশজন বাঙালী পুরুষ ও পঞ্চাশ-জন নারী। দক্ষ কিছু নাবিক, আমাদিগের বংশের বৈদ্যরাজ ও কয়েক-জন বিভিন্ন বৃত্তির দক্ষ কারিগর।

শ্রীমান ললিতাদিত্যের রক্তে রাজাধিরাজ নরেন্দ্রাদিত্যের বীর্য প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি। শ্রীমান ললিতাদিত্য গিয়াছেন কোন উপনিবেশ স্থাপনের অভিপ্রায়ে। প্রস্থানের পূর্বে এই অর্ধ কণ্ঠহার তিনি বিশেষ ভাবে দ্বিখণ্ডিত করিয়া এক অংশ আমার কাছে রাখিয়া অন্য অংশ নিজের সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই মণিহার শোভা পাইত রাজাধিরাজ শশাঙ্ক নরেন্দ্রাদিত্যের কণ্ঠে।

এই অর্ধ মণিহার এখনো আমার অধিকারেই রহিয়াছে। ভাবী বংশধরদিগের প্রতি আমার এই নির্দেশ রহিল তাহারা যেন পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে এই অলঙ্কার খণ্ড সযত্নে রক্ষা করে প্রাচীন গৌরবের অভিজ্ঞান স্বরূপ।

আবার এমনও হইতে পারে শ্রীমান ললিতাদিত্য পৃথিবীর কোন অজ্ঞাতস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাহা যদি সম্ভব হয় তবে কালক্রমে তাহারা লক্ষে উত্তীর্ণ হইবে। হয়তো তাহারা স্বাধীনতা ভোগ করিবে। যে স্বাধীনতার আনন্দ হইতে বঙ্গভূমিতে থাকিয়া যাওয়া বংশের অপর শাখার আমরা বঞ্চিত থাকিয়া যাইব বলিয়া আশঙ্কা করিতেছি।

শেষ অনুরোধ, গৌড়ভুজঙ্গের বংশের কোন ভবিষ্য পুরুষ যদি এই অলঙ্কার মধ্যস্থিত তুলোট লিপির মর্মোদ্ধার করিতে পারেন, আর্থিক ও দৈহিক সামর্থ্য অর্জন করিতে পারেন ; তিনি যেন ললিতাদিত্যের নেতৃত্বে আমাদের যে বংশধারা নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছিল তাহাদের অনুসন্ধান করেন। তিনি যেন প্রয়াস পান ওই বংশধারা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে না কর্মপ্রতিভার স্বাক্ষর রাখিতে সক্ষম হইয়াছে নবজাত কোন

নব জাতির দেহে-মনে কর্ম প্রচেষ্টায়। যদি সে সন্ধানের ফল ইতিবাচক হয়, আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ রহিল প্রবাসী সেই বঙ্গজাতির সহিত তৎকালীন এতদ্দেশীয় বঙ্গবাসীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যেন তিনি প্রচেষ্ট হন।”

চিঠি পড়া শেষ হল।

সকলেই নিস্তব্ধ।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন অনিরুদ্ধ—‘এবার তাহলে ?’

কোন কথা নেই জয়ন্তের মুখে।

আবারও প্রশ্নটা করলেন অনিরুদ্ধ, কিছু একটা শুনতে চাইছেন তিনি।

জয়ন্ত তাকাল। ‘কিসের তাহলে ?’

‘ললিতাদিত্য কোথায় তাঁর নব রাজ্য স্থাপন করেছিলেন তার খোঁজের কি করবে ?’

আকাশ থেকে পড়ল জয়ন্ত। ‘আমি ? আমি কি করব ? নাটবল্টু কোম্পানীর সাড়ে চারশ’ টাকা মাইনের কেরাণী আমি। হতে পারি হয়তো আদিত্য বংশের কেউ !’

‘হতে পার না। তুমিই গৌড়ভুজঙ্গ নরেন্দ্রাদিত্য শশাঙ্কের বংশধর। তেরশ’ বছর পরে এখন তুমিই একমাত্র জীবিত পুরুষ এবং যুবক সেই বংশের—যার শরীরে শক্তি আছে, সাহস আছে, আর কাছে আছে বংশের পুরনো অভিজ্ঞান।’

‘আপনার কথা মেনে নিলেও আনন্দাদিত্যের কথা মতো আমার আর্থিক সামর্থ্য নেই।’

‘তোমার নেই, আমার আছে।’

‘তাতে আমার কি লাভ ?’

‘আমি তোমার সঙ্গে যাব।’

‘আপনার খরচা করার মতো টাকা থাকতে পারে। আর এই বুনো হাঁস তাড়ানোর জন্য সেই টাকা আপনি অঢেল খরচ করবেন—

সেটা আপনার ইচ্ছে। কিন্তু আমাকে সেখানে নিমিত্ত করবেন—আমি তাতে রাজী নই।'

'অনেক গুলো কথা বলেছ। একটা একটা করে জবাব দিই। প্রথমত—হ্যাঁ আছে। আমার অঢেল টাকা আছে, দেশে ও বিদেশে। সে টাকা আমি খরচা করতে পারি নিজের ইচ্ছে মতোই। সেটা ঠিক। দ্বিতীয়ত—তোমাকে নিমিত্ত না করলে আমার এই অভিযান সম্ভব নয়, কোন কাজেই দেবে না আমার খরচ—বা শারীরিক কষ্ট। তৃতীয়ত—'

'তৃতীয়ত ?'

'যেটাকে তুমি বুনো হাঁস বলছ সেটা বুনো হাঁস নাও হতে পারে—'

'সেটা তো আপনার ধারণা।'

আবার নামল সেই তিনখানা বই ও খাতা। 'পড়ে দেখ—অনিরুদ্ধ বোস দীর্ঘকাল ধরে শুধুই বুনো হাঁস খুঁজে বেড়ায় নি।' একটু উত্তেজিতই মনে হল অনিরুদ্ধ বোসকে। পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন তিনি। হাতদু'টো পিছনে। জয়ন্ত বইদু'টো আর খাতাটা নাড়াচাড়া করতে করতে খাতার সেই পাতাটায় এসে থামল। তাকিয়ে থাকল অধ্যায়ের নামটার দিকে।

'আপনি এই যে অর্ধহারের ছবি এঁকেছেন—একি কল্পনা থেকে ?'

'অবশ্যই—কেননা তোমার এই অর্ধহার তো এইমাত্র দেখলাম আমি।'

'তাহলে আপনি এই অর্ধহারের ছবি বা তার কল্পনা করলেন কি ভাবে ?'

'সেইজন্যই তো পড়তে দিয়েছি। পড় না।'

জয়ন্ত একটু হাসল—সে হাসির মধ্যে মেশানো রয়েছে অভিমান।

'আমার সব কথাই আপনাকে বলেছি নিসঙ্কোচে। আমার ইংরেজী বিদ্যেয়—'

'তোমাকে আমি আঘাত করতে চাইনি জয়ন্ত। তুমি কথাটা ওভাবে নিলে আমি কষ্ট পাব।'

আবার অনিরুদ্ধ সোফায় বসলেন। খাতাটা নিয়ে পড়তে যাবেন—

'আচ্ছা একটা প্রশ্ন করব ?' জয়ন্ত বলল।

'নিশ্চয়। হাজারটা প্রশ্ন কর।'

'নরেন্দ্রাদিত্য বুঝলাম। শশাঙ্কের নামও শোনা আছে। কিন্তু এক্ষুনি বললেন গৌড়ভুজঙ্গ—আপনি বললেন এখন—জ্যাঠামশায়ও তাঁর চিঠিতে লিখেছেন গৌড়ভুজঙ্গের আশিসের কথা—তিনি কে ?'

'জান বোধহয়। শশাঙ্ককে পরাস্ত করতে হর্ষবর্ধনের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল!'

'সে একটু আধটু ইতিহাস যা মনে আছে।'

'খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে শশাঙ্ক রাজত্ব করে গেছেন। ছয়শ' সাঁইত্রিশ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বেঁচেছিলেন বলে কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন। হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের উপর এমনই ক্ষিপ্ত ছিলেন যে শশাঙ্কের নামোল্লেখ না করে তাকে বলতেন 'গৌড়ভুজঙ্গ' অর্থাৎ গৌড়ের সাপ। ভাবটা অনেকটা ছিল এই রকম 'বাংলা দেশের কালকেউটে'। চট করে সাপের কথা শুনলেই মানুষের মনের মধ্যে যে ভাবটা আসে সেটা একটা গা শিরশিরানির ভাব—ভয় এবং কিছুটা ঘেন্না! হর্ষবর্ধন এ ধরনের একটা কু-নাম তাঁকে দিয়েছিলেন। কিন্তু মজাটা হল—'

'মজা ?'

'হ্যাঁ মজাই। আমরা শার্দূল বলতে বাঘ বুঝি। বাঘের কথা শুনলে ভয় হয়। কিন্তু যদি কোন মানুষকে নরশার্দূল বল—তাহলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা ভীম পরাক্রমশালী পৌরুষ ব্যঞ্জিত চেহারা ও চরিত্র। 'গৌড়ভুজঙ্গ' কু-নাম না হয়ে শশাঙ্কের গৌরব বৃদ্ধি করে দিল।'

'কিভাবে ?' জয়ন্তের প্রশ্ন আবারও।

'বঙ্গদেশের মানুষ মনে মনে বুঝে নিল হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের বীর্য-শৌর্যকে ভয় পান। তাই গৌড়ভুজঙ্গ উপাধিটা বঙ্গবাসী মাথায় তুলে নিল শশাঙ্কের সম্মান রূপে।'

'সত্যিই আশ্চর্য ইতিহাস।'

'ইতিহাস তো আশ্চর্যের মালা।'

'তা এই গৌড়ভুজঙ্গেরই কণ্ঠহারের এক খণ্ড এখন এখানে!'

'হ্যাঁ। ঐ তো তোমার সামনে। বাকী খণ্ডটা—'

'তারই ইতিহাস কি আপনি শোনাতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ—আমার গবেষণা। আমি লণ্ডন মিউজিয়াম ঘেঁটে—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার খুঁজে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব-পশ্চিম দুই জার্মানীতে গিয়ে—জান বোধহয় জার্মানীতে প্রাচ্য দেশ সম্পর্কে অনেক গবেষণা হয়—এখানকার এসিয়াটিক সোসাইটি ঘেঁটে—যা কাগজপত্র পেয়েছি তাতে উল্লেখ আছে'—বলে গড়গড় করে তাঁর প্রবন্ধের অংশ পড়তে শুরু করলেন অনিরুদ্ধ। কিন্তু কিছুই মাথায় ঢুকছে না জয়ন্তের। হঠাৎ খট করে একটা শব্দ কানে এল তার 'হাফ্-চেইন'—তার মানে অর্ধহার!

'ঐ হাফ-চেইনটা কি?'

'সেটাই তো বলতে চাইছি।' খাতাটা কোলে রেখে বললেন অনিরুদ্ধ। ইউরোপ ও আফ্রিকার বেশ কিছু পণ্ডিত ঐতিহাসিক—ভূপর্যটকের ধারণা আছে যে আফ্রিকার কোন এক গভীরতম প্রদেশে আছে এক রাজ্য—যেখানে মূলত অধিবাসী যারা তারা অনতিশ্বেত। কিন্তু তারা ইউরোপীয়ান নয়। এবং তাদের উপাস্য—পরিচিত কোন দেব দেবী নয়। বহু পর্যটক—আবিষ্কারক চেষ্টা করেছেন সে স্থানটি আবিষ্কারের, এমন কি—'

এইবার হেসে ফেলল জয়ন্ত—'এমন কি ড. অনিরুদ্ধ বোসও।'

'হ্যাঁ অনিরুদ্ধ বোসও। কাগজপত্রে পূর্বসূরী ঐতিহাসিক গবেষকদের গ্রন্থে উল্লেখ পেয়েছি আমি এই রাজত্বের। কিন্তু ঐ হাফ-

চেইনের উল্লেখটা আমার। কেননা ও ইতিহাস আমিই সংগ্রহ করেছিলাম।'

'কি-ভাবে ?'

'সে আরেক ইতিহাস।

'তখন আমি লণ্ডনে। যুদ্ধ প্রায় শেষ হয় হয়। একদিন মিলিটারি হেড কোয়ার্টার থেকে বেরোচ্ছি—অন্যমনস্ক হয়েছিলাম, কিসে একটা হোঁচট খেয়ে পায়ে লাগল—স্বভাবতই ব্যথা বেদনায় কষ্টে পড়লে যেমন আপনা থেকেই গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে—আমারও গলা দিয়ে বেরিয়ে এল সে রকমই একটা শব্দ। 'মাগো'। খেয়াল করিনি—আমার সামনেই দাঁড়িয়ে তখন ভিতরে ঢুকবেন এমন এক সুন্দর মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি। আমাকে তুলে ধরে ইংরেজীতে বললেন—"ব্যথা পেয়েছেন ;" আমি বললাম—'সামান্য'। ভদ্রলোক বললেন, "কিন্তু আপনি পড়ে গিয়ে কি একটা শব্দ উচ্চারণ করলেন যেন ? ওটা কোন ভাষা ?" আমি বললাম। বললাম আমার মাতৃভাষা কি ? আমি কোথাকার লোক।

'ভদ্রলোক কোন কথা না বলে কেবল আমাকে ওঁর কোয়ার্টারে যাবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। প্রায় পীড়াপিড়ি। হাতে সেই মুহূর্তে কোন কাজ না থাকায় গেলাম। অসুবিধে ছিল না—কেননা ভদ্রলোকও মিলিটারির।

'ওঁর বাড়িতে গিয়ে তো বসলাম। বসে বললাম—আমি তো আমার নাম পরিচয় দিয়েই এসেছি—আপনার পরিচয়টা তো পেলাম না।

'ভদ্রলোক কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন তাঁর নাম। নামটা একটু কি ধরনের যেন—"আরজুয়ান মালেক"। বললেন, "আসলে উনি অধিবাসী লিবাম্বির, বেলজিয়ান কঙ্গোর অর্থাৎ আফ্রিকার একটা জায়গা।"

'কি রকম খটকা লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম আপনি সঠিক কোন

দেশের লোক? আপনার গায়ের রঙ্‌তো ইউরোপীয়ানদের মতো অত সাদা নয়—তবে ফর্সা—অতএব আফ্রিকান নয়। নামটাও আবার কেমন যেন মুসলিম আফ্রিকান মেশানো।

'ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে গেলেন। কেবল বললেন—"আমি মিলিটারির এমন একটা চাকরি নিয়ে আছি—যে প্রথম দিনেই সব কথা আপনাকে বলতে পারছি না—আর দু'-চারদিন যাক্—"

'কিন্তু অনিরুদ্ধকে কেন ডেকে এনেছেন তিনি!

'অনিরুদ্ধের দেশ সম্পর্কে জানার আগ্রহে।

'অনিরুদ্ধ গবেষক। অনিরুদ্ধ ঐতিহাসিক। অনিরুদ্ধও মিলিটারিতে আছেন। সর্বোপরি অনিরুদ্ধ বোকা নয়।

'অনিরুদ্ধ তাঁর দেশের কথা বললেন। ভাষার কথা বললেন। আর ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন একদৃষ্টিতে। ক্ষণে ক্ষণে ভাবান্তর ঘটছে সেখানে। যেন কোন পুরনো স্মৃতির ঘায়ে কেউ আঘাত করছে।

'সেদিনকার মতো সেখানেই ইতি।

'দু'-একদিন বাদে অনিরুদ্ধ নিজে থেকেই গিয়ে উঠলেন মালেকের বাসায়।

'সেদিন মালেক তবু মুখ খুললেন। বললেন, "তাঁরাও প্রবাসী বাঙালী। কত পুরুষ আগে যে তাঁরা তাঁর বর্তমান বাসভূমিতে এসেছেন তা তাঁর জানা নেই। তাই তাঁর এত আগ্রহ বাংলা দেশ সম্পর্কে।"

'অনিরুদ্ধ কথা বলতে জানেন। বসন্তের 'আদিত্য' শব্দ—এবং লণ্ডন মিউজিয়ামে কাজ করার সময়ে কিছু নথিপত্র তাঁকে এমন একটা ইতিহাসের ইঙ্গিত দিচ্ছিল যাতে তিনি ইচ্ছে করেই জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা মালেক সাহেব, আপনারা তো এদিকে এসেছেন অনেক অনেক কাল আগে—বাংলা দেশের ইতিহাসও কিছু জানেন না বোধহয়। কিন্তু কোনদিন কি কোনভাবে 'আদিত্য' বংশের নাম শুনেছেন?"

'সেদিন মালেক থর থর করে কেঁপে উঠেছিলেন।

'তবু জবাব দেননি। কেবল বলেছিলেন, "আজ থাক।"

'অনিরুদ্ধ তাঁর পিছু ছাড়েননি।

'দু'-মাসের প্রচেষ্টায় মালেকের কাছ থেকে এটুকু আদায় করতে পারলেন যে তিনি উড়ো উড়ো শুনেছেন—আফ্রিকার ঘোরতম প্রদেশে কোথাও একটা স্বাধীন রাজত্ব আছে—সেখানে উপাস্য—একটি অর্ধ কণ্ঠহার। রাজত্ব যাঁরা করেন তাঁদের গায়ের বর্ণও তাঁরই মতো।

'কিন্তু দুর্ভাগ্য। তার পরে যেদিন অনিরুদ্ধ মালেকের খোঁজ করলেন—তাঁকে আর খুঁজে পেলেন না। মিলিটারি কোয়ার্টারে খোঁজ নিয়ে শুনলেন—যে কাজে মালেক নিযুক্ত ছিলেন সে কাজ শেষ হয়ে গেছে—তাই মালেক নিজের দেশে ফিরে গেছেন। অনিরুদ্ধ কিন্তু বিশ্বাস করেন নি।

'পরবর্তী কালে অনিরুদ্ধ নিজে যখন অনুসন্ধানে বেরোন তখন গিয়েছিলেন তিনি লিবাম্বিতে। লিভপোল্ডভিল—আগেকার বেলজিয়ান অধিকৃত কঙ্গোর রাজধানী বর্তমানের স্বাধীন 'কিনসাসা'র কাছে—কিন্তু লিবাম্বিতে তিনি খোঁজ পাননি মালেকের। যেমন অনেক ঘুরে—তাঁর মতে ভুল পথে গিয়ে তিনি খোঁজ পাননি—স্বাধীন ঐ রাজ্যটির। হয়তো পেতেন—কিন্তু তাঁর সঙ্গী সাহেব পর্যটক বেন হার্ডলি অসুস্থ হয়ে মারা পড়ায় তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছিল।

'তাছাড়া গবেষণা—এবং কিম্বদন্তী তাঁকে এই বিশ্বাস জাগিয়ে দিয়েছিল যে কোন একটা কিছু প্রমাণ তাঁর চাই—যা কিনা সন্ধান পেলেও ঐ রাজ্যে তাঁকে প্রবেশাধিকার দেবে।'

দীর্ঘ এই গল্প মোহিত হয়ে শুনছিল জয়ন্ত। ইলোরা অনেকক্ষণ ঘরে ছিল না। ফিরে এল চা—আর কিছু খাবার নিয়ে।

'তাই কি আপনি আবার দেশে ফিরলেন?'

'হ্যাঁ—'বসন্ত আদিত্য' নামটা এবং ইতিহাসের গবেষণা আর

কিম্বদন্তী সব কিছুই আমাকে টেনে আনল এই নবনগরে। এখন তোমার সাহায্য পেলে চেষ্টা করব বুনো হাঁসকে ধরার।'

'হয়তো হতে পারে আপনার এই গবেষণা ও অনুসন্ধান সত্যিই একদিন প্রমাণ করতে পারবে পৃথিবীর কোথাও একটা স্বাধীন ভূখণ্ড রয়েছে যেখানে এখনও বাংলার সেই গৌড়ভুজঙ্গের বংশধররাই বিরাজ করছেন সসম্মানে। কিন্তু—'

'কিন্তু আপনার মনের মধ্যে খোঁচা মারছে তো একটা কথাই— আপনার আথিক সামর্থ্য নেই—আপনি বাপীর পয়সায় এরকম কোন অভিযানে যেতে ইচ্ছুক নয়, এইতো?' প্রশ্নটা ইলোরার।

জয়ন্ত নীরবে মাথা নীচু করে বসে রইল। মৌনতাই তার নীরব সম্মতি, ইলোরার কথায়।

'আচ্ছা জয়ন্তদা' 'ইলোরা তাকে আজকাল এই সম্বোধনই করে—, 'একবার কল্পনা করতেও তো পারেন একটা ছবি! কোন এক প্রয়াত যুগের দুর্দম বীর, ইতিহাসের পাতায় যাঁর স্থান প্রায় অর্ধবিস্মৃত, অপহাস্ত করে যাঁর নাম দিয়েছিলেন হর্ষবর্ধন 'ভুজঙ্গ'—যে ভুজঙ্গ দংশন করতে জানে আবার জানে অনন্তশয্যা রচনা করে নব-সৃষ্টির উত্তরসাধক তৈরি করতে—সেই শশাঙ্কের কথা। শশাঙ্ক অনন্তশয্যা নিয়েছিলেন, বীরধর্ম পালন করেছিলেন। তাঁরই উত্তরসূরী ললিতাদিত্য তো সেই রক্তেরই বাহক। পৃথিবীর কোন অজ্ঞাত প্রদেশে তিনি শশাঙ্কের নামে হয়তো প্রতিষ্ঠা করেছেন এক নবরাজ্য। অন্ধ আদিম অরণ্যের মাঝে হয়তো পাহাড় ঘেরা কোন কিরীটিনী তটিনী সেখানে নেচে নেচে তরঙ্গ তুলে ধাবিতা—তারই কূলে কূলে প্রাচীন বাংলার উত্তরসূরীরা এখনও বাঙালী ঐতিহ্যের ধারাকে বহন করে চলেছে। মাঠে মাঠে ধানের ঢেউ খেলে যাচ্ছে, বর্ষার জলভার বহন করে উদ্দাম পবন! সূর্য সেখানে ওঠে রক্তিম হয়ে, প্রভাতে সেখানে হয়তো গীত হয় বাঙালী-বাঙালিনীর কণ্ঠে সামগান, সন্ধ্যায় সেখানে তুলসীর মঞ্চে প্রদীপ জ্বেলে গৃহবধূরা কামনা

করে সংসার ও জাতির মঙ্গল। মন্দিরে সেখানে আরতির ঘণ্টা বাজে, জীমূতমন্দ্র কণ্ঠে উচ্চারিত হয় দেববন্দনার পরিবর্তে কণ্ঠহারের অধিপতি নরেন্দ্রাদিত্যের বন্দনা—পরম উৎকণ্ঠায় যেখানে সসৈন্য এক বীরজাতি অপেক্ষা করে আছে কোন একদিন অর্ধ মণিহার বহন করে অবতীর্ণ হবেন আরেক ললিতাদিত্য যাঁর দেহে আছে শশাঙ্কের শোনিত, মনে আছে ললিতাদিত্যের উদ্যম, হৃদয়ে আছে বাংলার কোমলতা ; ভাষা যাঁর তাঁদের মতোই সুমধুর বঙ্গভাষা। যেখানে হয়তো আপনি যে সাম্যের স্বপ্ন দেখে শ্রমিকদের জন্য পরিশ্রম করেন, সেই সাম্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অথবা প্রতীক্ষায় আছে সেই আদিত্য-শূরের যিনি এসে প্রতিষ্ঠা করবেন সভ্যতার নতুন ধারা ; কয়েক সহস্র যোজন দূরের দুই বাংলার সংস্কৃতি স্রোত প্রবাহিত হবে একই ধারায়।'

কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল জয়ন্ত! ইলোরার কণ্ঠে—সুমধুর ছবি যেন তার আয়ত চোখের তারায় এক নব বাংলার প্রাচীন ছবি চল-চ্চিত্রের মতোই ভেসে ভেসে উঠেছে। জয়ন্ত বাহ্যজ্ঞান রহিত। তার চোখে তখনও ভাবালুতা। অতি বাস্তব জয়ন্তও মোহাচ্ছন্ন ইলোরার কণ্ঠে আবৃত্ত কল্পনায়।

অনেক—অনেকক্ষণ বাদে বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠল জয়ন্ত। 'যাব। তবে একটা শর্ত আছে।'

'যাবে ? যাবে তুমি ?' অনিরুদ্ধের কণ্ঠে আগ্রহ ও উৎসাহ, 'বল একটা কেন—তোমার যে কোন শর্তই আমি মানতে রাজী আছি।'

'অনুসন্ধান সফল হলে আপনি কি পাবেন আমি জানি না—'

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে একটু মুচকি হেসে অনিরুদ্ধই বললেন, 'একটা জায়গীরদারি দিয়ে দিও। ওপাশে অনেক মেহগিনি কাঠের জঙ্গল আছে, আছে প্রচুর হাতি, চাই কি দু-একটা হীরের খনিও পাওয়া যেতে পারে—কাঠ, হাতির দাঁত আর হীরে চালান দেব আমি।'

জয়ন্তও হাসল ; 'দেবেন। রাজত্বটা যখন আমার হাতে আসবে আপনি পুরো রাজত্বটাই নেবেন, তাতে একটা নাট বল্টুর কারখানা খুলে দেবেন—যাতে এখানকার সাড়ে চারশ' টাকা মাইনেটা ওখানে গিয়ে মার না যায়।'

সকলেই হেসে উঠলেন। অনাবিল উচ্চকণ্ঠে।

জয়ন্ত আবার খেই ধরল, 'কিন্তু আমি তা বলতে চাই নি—আমি বলতে চেয়েছি— যদি অনুসন্ধান সফল না হয় তবে—'

'তবে ?'

'যদি সফলতা না আসে তবে ঐ কণ্ঠহার এবং এই কোট হবে আপনার সম্পত্তি। তাতেও আমার ঋণ থেকেই যাবে।'

'শশাঙ্কের বংশধরের উপযুক্ত কথা। যাক সে পরের ব্যাপার।'

'পরের হতে পারে তবে এইটাই ভদ্রলোকের চুক্তি।' জয়ন্তের উত্তর।

'আচ্ছা বাবা আচ্ছা'—অনিরুদ্ধ হেসে জবাব দিলেন।

'কিন্তু মা!' জয়ন্ত হঠাৎই যেন আবার কঠিন বাস্তবে ফিরে এসেছে।

'আমি যে ভাবিনি সে কথা, তা নয়। বৌঠানের সঙ্গে আমি কিছু কথা আগে বলেও রেখেছি।'

'সে কি ? আপনি মাকে বলেছেন এই সব কথা ?'

'একটু মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়েছে। বলেছি যদি তোমাকে কিছু-কালের জন্য বিদেশ ঘুরিয়ে আনি, এখানে একটা ভালো চাকরি পেতে পার—এইভাবে—ঘুরিয়ে—তা যাহোক্ মন খারাপ হলেও—রাজী হয়েছেন। বলেছি রামলাল থাকবে—আর টাকা পয়সার ব্যবস্থা করে রেখেই তুমি যাবে।'

জয়ন্ত বুঝল। অনিরুদ্ধ বোসের অসাধ্য কিছুই নেই। মাকে নিশ্চয় তিনি এমন ভাবে বুঝিয়েছেন—যাতে মা রাজী। কিন্তু আজ কে কোর্ট থেকে ফিরে মার সঙ্গে দেখা হল, বললেন তো না কিছু মালতী দেবী। হয়তো রাত্তে বলবেন।

নাটবল্টু চৌধুরিদের কাজটা গেল। তা আর কি করা!

জয়ন্ত যেতে রাজী শুনেই ইলোরা আবার ঘর থেকে চলে গিয়েছিল—এবার ফিরে এল কাগজে মোড়া কি একটা নিয়ে। মোড়কটা খুলতে খুলতে বলল, 'দেখুন তো জয়ন্তদা-চিনতে পারেন কি না!' দেখল জয়ন্ত। অনন্ত আদিত্য যেন জীবন্ত হয়ে তাকিয়ে আছেন।

'কখন করলে এসব? কি ভাবেই বা করলে?'

'হুঁ হুঁ বাবা। আপনি হাজতে লপসি খাচ্ছেন যখন, আমি তখন এটাকে একজন শিল্পীকে দিয়ে ঠিক করিয়ে নিয়েছি। ফটোও তুলে রেখেছি। বলা যায় না—আপনার নতুন রাজ্যে এটার হয়তো গুরুত্ব থাকতে পারে।'

'ভালো কথাই বলেছে ইলোরা' অনিরুদ্ধের কণ্ঠ।

'কিন্তু বাপী তোমার—আমার পাসপোর্ট তো আছে, জয়ন্তদার পাসপোর্ট তো লাগবে—'

তোমার—আমার—তার মানে ইলোরাও সঙ্গে যাবে নাকি!

বিস্ময়ের সঙ্গে জয়ন্ত প্রশ্নটা করেই ফেলল।

ইলোরাই এবার ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি? 'তার মানে—আমায় বাদ দিয়ে অভিযান—। এ ঘর থেকে জ্যান্ত বেরোতে দেব আপনাকে?'

চোখ দু'টোর দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত আর কিছু বলতে সাহস পেল না। সত্যিই শুধু সাঁতার আর দৌড়বীর হয়ে ও যদি অনিরুদ্ধের ভরসায় যেতে পারে—তবে ইলোরা অনেক বেশী ক্ষমতা ধরে এ ধরনের অভিযানে। ছবিগুলো এমনি এমনিই দেখায়নি মেয়েটা। হাড়ে হাড়ে ওর বুদ্ধি।

তবু ঠাট্টা করতে ছাড়ল না—'পড়নি? পথি নারী বিবর্জিতা—'

'মেয়েরাই আবার শক্তির অংশ, পড়েন নি? তাছাড়া যাকে বাদ দিতে চাইছেন সেই হয়তো একসময়ে আপনার উদ্ধারকর্ত্রী হতে পারে যুবরাজ আদিত্য!'

হেসে উঠে পড়ল জয়ন্ত।

দশ

চাকরিটা পরের দিনই ছেড়ে দিল জয়ন্ত।

তারপর পনের দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল। ঝড়ের গতিতে। অনিরুদ্ধ সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে ছুটছেন ক'লকাতার সর্বত্র। রাতে যখন বাড়ি ফেরেন সঙ্গে থাকে জিনিসের পাহাড়।

সকালে বেরোবার সময়ে অবশ্য গাড়িতে জয়ন্তও থাকে, থাকে ইলোরা।

কোন কোন দিন জয়ন্ত ইলোরা আলাদা ফেরে, কোন কোনদিন অনিরুদ্ধ ওদের তুলে নেন রাইফেল স্যুটিং ক্লাব থেকে।

হ্যাঁ—ইলোরা জয়ন্তকে নিয়ে এই পনের দিন প্রায় বারঘন্টা ধরে রাইফেল স্যুটিং ক্লাবে রাইফেল ছোঁড়া অভ্যাস করাতে নিয়ে যাচ্ছে।

যেখানে যেতে হবে, বন্দুক ছুঁড়তে না জানলে সেখানে এক-পাও এগনো যাবে না। আর জয়ন্তের ও পাঠ-তো আগে নেওয়া ছিল না।

ইলোরা অধিকাংশ দিনই বসে থাকে জয়ন্তের স্যুটিং অভ্যাস পর্যবেক্ষণের জন্য। দু'-একদিন অবশ্য বেরিয়েও যায় নিজের কিছু কেনাকাটার তাগিদে।

কয়েকদিনের মধ্যেই জয়ন্তের টিপ হয়ে উঠল অব্যর্থ।

প্রশিক্ষক আর ইলোরা—দু'জনেই অবাক—এতো তাড়াতাড়ি এ রকম অব্যর্থ টিপ—চাঁদমারি ভেদে এরকম সাফল্য চট করে দেখা যায় না।

অনিরুদ্ধ তাই শুনে পরের দিন দুপুর বেলা জয়ন্তকে ক'লকাতার এক বড় রেঁস্তোরায় একটা ভোজই খাইয়ে দিলেন।

এ কদিন জয়ন্তও নজর দিতে পারে নি—অনিরুদ্ধ এতো কি কেনা-কাটা করছেন।

যেদিন তার সময় হল, সেদিন প্রায় মুচ্ছো যায় আর কি!

কি নেই! টিন বন্দী খাবারের পাহাড়, অজস্র বন্দুক-রাইফেল-রিভলভার। বাক্স-বাক্স গুলি। কি নয়! মায় গোটা তিনেক তাঁবু পর্যন্ত। আর—!

অনিরুদ্ধ একটা মোড়ক খুলে একটা আধুনিক স্যুট বার করে দিয়ে বললেন, 'পরে দেখ তো—গায়ে লাগে কিনা?'

জয়ন্ত বলল—'এটা আবার কি?'

অনিরুদ্ধ বললেন, 'আহা পরই না।'

জয়ন্ত আজকাল আর অবাক হচ্ছে না কোন কিছুতেই। পরল। একেবারে প্রত্যেকটি ইঙ্গিতে দক্ষ দর্জির হাতের কাজ। আয়নায় নিজেকে দেখে জয়ন্ত চিনতেই পারে না।

বুঝল তার মাপেই এগুলো তৈরি হয়েছে! তাই বলে একেবারে কুড়িটা!

'আহা বুঝছ না কেন! যদিই পাওয়া যায় জায়গাটা, রাজাধিরাজ শশাঙ্কের বংশধর তেরশ' বছর বাদে যখন উপস্থিত হবে ঐ নতুন বাংলায়।' তার একটু পোশাকে আশাকে চাকচিক্য লাগতে পারে। তা সেখানে তখন পাব কোথায় এই দর্জি!'

জয়ন্ত বুঝল কোন ফাঁকে গিয়ে অনিরুদ্ধ মালতী দেবীর কাছ থেকে তার একটা ছেঁড়া সার্ট এবং প্যাণ্ট নিয়ে এসেছেন নাহলে এ রকম মাপ ঠিক হয় কি করে।

* * * *

সেদিনকার কথা বার্তার ঠিক পনের দিন বাদে। এক গভীর

রাতে। ক'লকাতা খিদিরপুর ডক থেকে বেশ দূরে গঙ্গার মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে একখানা ভারতীয় জাহাজ, মাল এবং যাত্রীবাহী।

উড়ছে তাতে স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত অশোক চক্র চিত্রিত স্বাধীন পতাকা। জাহাজটার নাম 'ছত্রপতি শিবাজী'।

পরের দিন ভোর সাতটায় রওনা দেবে জাহাজটা। আফ্রিকার বিভিন্ন বন্দরে তার মাল ও যাত্রী আনা নেওয়া কাজ। অবশ্যই আফ্রিকার পশ্চিম দিকে আটলান্টিকের দক্ষিণ-তীর ঘেঁষা বন্দরগুলোই তার গন্তব্যস্থল।

জাহাজ ছাড়বে পরের দিন সকাল বেলা। কত দিন বাদে আবার স্থল পাওয়া যাবে, কতদিন বাদে আবার ছুটি মিলবে কে জানে—তাই তাবৎ নাবিক-খালাসী—উর্ধ্বতন কর্মচারী পর্যন্ত নেমে গেছে ক'লকাতার মাটিতে—আনন্দ করতে—ভোর রাতের আগে ফিরলেই হল। সামান্য দু'একজন যাত্রী আগেই এসে যেতে পারেন—তাই কয়েকজন মাত্র কর্মচারী রয়ে গেছেন জাহাজে।

তা সেই জাহাজ লক্ষ্য করেই নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে আলোহীন একটা নৌকো। আলো নেই—অতি সাবধানে প্রায় চোরের মতোই হাবভাব নৌকোটার গতি ও ভঙ্গিতে। নিঃশব্দেই এসে পৌঁছোল নৌকোটা জাহাজের পিছন দিকে। জাহাজের এদিকটায় ক্বচিৎ প্রয়োজন পড়ে কারো। নৌকোটা এসে থামল সেখানে। একটা শিস দিয়ে উঠল নৌকোর একটি লোক। অমনি অন্ধকারে জাহাজের ঐ দিকে জ্বলে উঠল একটা টর্চ। নেমে এল একটা দড়ির সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়েই উঠে এলেন প্রথমে অনিরুদ্ধ তারপর জয়ন্ত। তারপর আরো একটি লোক। নৌকোটা থেকে ধীরে ধীরে উঠতে লাগল মালপত্র। অবশেষে উপর থেকে নেমে এল একটা ব্যাঁকানো হুক লাগানো দড়ি—নৌকোর গায়ে আটকানো আংটায় সেটা লাগিয়ে দিয়ে শেষ লোকটি উঠে এল জাহাজে, তারপর উঠে এল রবারের নৌকোটাও।

উপরে দাঁড়িয়ে ছিল আগে থেকেই ইলোরা। টর্চটা সেই

জ্বালিয়েছে, দড়ির সিঁড়িও সেই নামিয়েছে। অনিরুদ্ধ এবং জয়ন্তের সঙ্গে যে লোক দু'টি উঠল তাদের একজনের নাম কানু—কানাই থেকে কানু। আরেকজন বাসু। বাসুদেব এর অপভ্রংশ।

লোক দু'টি এই জাহাজেরই খালাসী। জাতে বঙ্গবাসী। পূর্ব-বাংলায় বাড়ি (১৯৭১ এর পর যা স্বাধীন বাংলাদেশ)। সেই চট্টগ্রামের দিকে। সমুদ্দুর তাদের ঘর বাড়ি।

অনিরুদ্ধ এদের প্রচুর বকশিশ দিয়েছেন—তাই ওরা খুবই বিগলিত চিত্তে অনিরুদ্ধ জয়ন্তকে গোপনে এভাবে জাহাজে তুলে দিল —তুলে দিল মালপত্র।

কিন্তু কেন এই গোপনীয়তা ?

আসার আগে অনিরুদ্ধ ব্যারিস্টার ঘোষের সঙ্গে কথা বলেই এসেছেন, মোটামুটি আভাসও দিয়েছেন। বিশ্বাস আছে অনিরুদ্ধর ব্যারিস্টার ঘোষের উপর। বলেছিলেন অনিরুদ্ধ জয়ন্তের পাসপোর্টের প্রয়োজনের কথা। কিন্তু—

'মাথা খারাপ হয়েছে তোমার। পাসপোর্ট পেতে গেলে স্থানীয় রিপোর্ট চাই। তা কি রিপোর্ট দেবে তোমার ওই রতন পাকড়াশি তা কি তোমায় বলে দিতে হবে ?'

'তাহলে ?' প্রশ্ন করেছিলেন অনিরুদ্ধ।

জবাবে ব্যারিস্টার ঘোষ যা বলেছিলেন এবং অনিরুদ্ধ যা করেছেন সেটা আইনের পরিভাষায় সৎ বলা চলে না। কিন্তু নিরুপায় অনিরুদ্ধ। এক রতনের ফিচ্‌লেমির জন্য এই বিরাট অভিযান আটকানো যায় না। কাগজপত্র জয়ন্তের নামেও তিনি তৈরি করিয়েছেন। কিন্তু ভারতের সীমানা না পেরিয়ে তিনি চট করে ওগুলো বার করতে চান না। তাই এই সাবধানতা। তাঁর নিজের আছে আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট। ইলোরারও। ইলোরা তাই সামনে দিয়েই উঠেছে গটগটিয়ে। অনিরুদ্ধও পারতেন। কিন্তু জয়ন্তকে তুলতে হবে—নিতে হবে মালপত্র। তাই তিনিও জয়ন্তের সঙ্গী।

জয়ন্তের পাসপোর্ট এবং এই বিপুল মাল—এই দুই কারণেই প্লেনে যাওয়ার চিন্তা বাতিল করতে হয়েছে অনিরুদ্ধকে। জলজাহাজে গোপনে পিছন দিক দিয়ে যদি বা ওঠা যায়—প্লেনে তা সম্ভব নয়। আর পাসপোর্ট দেখায় কড়াকড়িটা বিমান বন্দরে অনেক বেশী।

'ছত্রপতি শিবাজী' জাহাজে দুটো কেবিন নেওয়া হয়েছে। একটা ইলোরার জন্য অন্যটায় অনিরুদ্ধ জয়ন্ত। মালপত্রও সেখানে ঢুকেছে। রাতের খানা খেয়েই এসেছেন তিনজন। তাই জয়ন্তকে নিয়ে তাড়াতাড়ি কেবিনে ঢুকে পড়লেন অনিরুদ্ধ। সাবধানের মার নেই। জাহাজ যতক্ষণ না ছাড়ছে—ততক্ষণ আবার শান্তি ও নেই।

তাই জয়ন্তকে কেবিনে রেখে ইলোরাকে সতর্ক করে অনিরুদ্ধ ক্যাপ্টেনের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। আলাপ করে রাখা ভালো।

তানাজী ঘোরপাড়ে—একেবারে যেন শিবাজীর পরম অনুগত সেনাপতি তানাজীর দ্বিতীয় সংস্করণ। সেই তানাজীর চেহারার বিবরণ অনিরুদ্ধ বোস, ইতিহাসবেত্তারও জানা নেই—কিন্তু শিবাজীর প্রতি তাঁর অসীম ভক্তি ও আনুগত্য তো জানা আছে। তা—এই ক্যাপ্টেন তানাজী বোধহয় আরো এককাঠি উপরে ওই শিবাজী ভক্তির দিক দিয়ে। অনিরুদ্ধ শিবাজীর ইতিহাস ক্যাপ্টেন তানাজীর থেকে জানেন বেশী। মুহূর্তেই অনিরুদ্ধ ক্যাপ্টেনকে প্রায় বন্ধু বানিয়ে ফেললেন। শিবাজীর প্রতি অবিচল ভক্তি প্রদর্শনে অনিরুদ্ধের আন্তরিকতা তানাজীকে প্রায় বেঁধে ফেলল একটা আত্মীয়বোধ বন্ধনে।

জয়ন্তের সম্পর্কে তত্ত্বতল্লাশ সম্ভাবনাটা যদিও কম—তবু বলা তো যায় না—যদিই হয়, তাই ক্যাপ্টেনের দিক থেকে একটু সাহায্য পাওয়ার পথটা তৈরি করে রাখার জন্যই অনিরুদ্ধ এতটা করেছিলেন—

রাত কাটল। ভোর রাতের আগে থেকেই লোকজনের আনা-গোনা বেড়ে গেল। পাসপোর্টে যাদের ভয় নেই—সময় মতো তারা গটগটিয়ে সামনে দিয়েই ঢুকছে জাহাজে।

সকালের সঙ্গে সঙ্গেই যেন মেলা বসে গেল জাহাজের ডেকে। এখন তো বেরনো যায়। এই ভিড়ে কে কাকে দেখছে। তাই অনিরুদ্ধ-জয়ন্ত-ইলোরা ডেকে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন।

এই সময়ে নবনগরের বাসিন্দাদের কেউ যদি দেখত সে কি এই জয়ন্তকে চিনতে পারত। একশ' বার হলফ করে বলা যায়—না। পরনে একটা ধূসর রঙের স্যুট। মুখে চুরুট। অনিরুদ্ধর পাশে দাঁড়িয়ে ছ'ফুট দেড় ইঞ্চি লম্বা—গৌরবর্ণের এই যে যুবক রাজকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে—তার দিকে নজর পড়ছে আশ-পাশ দিয়ে যাতায়াত করছে যে, তারই। তাদের মধ্যে কেউ যদি ভেবে নেয় দশ বিশ লাখ টাকা হেলায় খরচা করার মালিক এই যুবক তাকে দোষ দেওয়া যায় না—এমনই এক দ্যুতি জয়ন্তের চেহারা থেকে ফুটে বেরোচ্ছে।

অনিরুদ্ধ-জয়ন্ত-ইলোরা। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। অনেকেই ভেবে নিল বড়লোকের কত রকমই খেয়াল। আধুনিক বিমান ছেড়ে এই জাহাজে করে বেড়াতে বেরিয়েছে এই লক্ষপতি পরিবার।

চুরুট। হ্যাঁ—এই চুরুট।

অনিরুদ্ধ জয়ন্তকে বুঝিয়েছেন—ধূমপান যখন সে করে, তখন অনিরুদ্ধের সামনেই ওটা এখন থেকে করতে হবে। আধুনিক সমাজে, বিশেষ করে বিদেশে ভারতীয় এই সংস্কার অসুবিধেতেই ফেলবে না হলে। সেখানে বয়স্কদের সম্মান দেওয়ার পদ্ধতিটাতে আর যাই থাক ধূমপানটা থাকে না। তা যতই কেন না স্যার বলুক অনিরুদ্ধকে। যদিচ অনিরুদ্ধ অনেক বুঝিয়েছেন—ওভাবে স্যার স্যার করলে অনেক জায়গায় তাঁকে অসুবিধেয় পড়তে হবে।

রফা হয়েছে, জায়গা বুঝে জয়ন্ত তাঁকে ড. বোস বলেই সম্বোধন করবে। অন্যথায় নয়। ইলোরাও তাকে নাম ধরেই ডাকবে সে রকম অবস্থায়। যতই ঝেড়ে ফেলা যাক—জয়ন্ত বাঙালী সংস্কার এককথায় উড়িয়ে দিতে পারে নি—অন্তত অনিরুদ্ধের বেলায় তো বটেই।

ডেকে পায়চারি করছেন তিনজন। হঠাৎই কানু—বাসুর একজন অনিরুদ্ধকে চুপি চুপি ডেকে নিয়ে গেল। কি চায় আবার লোকটা ? প্রয়োজন তো মিটে গেছে—মোটা টাকা বকশিশ মিলে গেছে। আবার কি ?

কিন্তু অনিরুদ্ধও চলে গেলেন লোকটির সঙ্গে।

কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এলেন তিনি।

'কি ব্যাপার ?' ইলোরাই জিজ্ঞাসা করল।

'আরে তোমার ঐ রতন পাকড়াশি তো কম ধুরন্ধর নয় হে। ঠিক নজর রেখেছে আমাদের গতিবিধির উপর। পাকড়াও করেছে ঐ কানুকে। খবরাখবর নিচ্ছিল আমাদের মতো চেহারার কোন যাত্রী জাহাজে উঠেছে কি না ?

'তারপর ?' উৎকণ্ঠা জয়ন্তের গলায়।

'খোঁজ খবর নিয়ে অবশ্য কানুর বা বাসুর কাছে ওর সুবিধে হয় নি। ওরা অকৃতজ্ঞ নয়। তাই তো কানু আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনল। জেটির উপর তখনও দাঁড়িয়ে হতভাগা।'

'হতভাগা নয়, জাত বদমায়েস।' জয়ন্তের গা'টা রি—রি করছে।

'এমনিতে জামিনে আছ তুমি। কোর্টে হাজিরার দিন উপস্থিত না থাকলে তখন বিপদ। তার আগে তুমি কোথায় যাচ্ছ কি করছ সেটা ওর দেখার এক্তিয়ারে পড়ে না। কিন্তু আমাদের ব্যস্ততা—ছোটাছুটি—ওর মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে আর কি ?'

অনিরুদ্ধ আবারও এগিয়ে গেলেন। একটু ঘুরে এসে বললেন—'না দেখা যাচ্ছে না। বোধহয় নিরাশ হয়ে ফিরে গেছে। এখন জাহাজটা ছাড়লে বাঁচা যায়।' বলতে বলতেই ভোঁ দিল জাহাজে। ধীরে ধীরে ভাসমান জেটির সঙ্গে লাগানো সিঁড়ি তুলে ফেলা হল। জাহাজ নড়তে শুরু করল।

জয়ন্ত তখন অন্যমনস্ক একটু। নবনগরের গঙ্গায় মা হয়তো এখন

স্নান করছেন। মনে মনে তার মঙ্গলকামনায় শত মানত করছেন তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর চরণে। অজান্তেই চোখ দু'টো ঝাপসা হয়ে এল তার। মনে মনে মায়ের পায়ে প্রণাম করল জয়ন্ত।

অনিরুদ্ধ খেয়াল করেছেন জয়ন্তের ভাবান্তর—ইলোরাও। ইলোরা তাই অবনতমুখী। হয়তো বা তাকেও স্পর্শ করেছে জয়ন্তের বেদনাটা। অনিরুদ্ধ অভিজ্ঞ। তাই সস্নেহে বললেন, 'চল খাবার ঘর থেকে প্রাতরাশটা সেরে আসি।'

সকালের খাবারের ঘণ্টা পড়েছে। খিদেও প্রচণ্ড। তিনজনে খেয়ে নিলেন। জয়ন্ত বিলেতী আদবকায়দায় এখনও ততটা রপ্ত হয়নি। তাই সঙ্কোচে ঠিক মতো খেতে পারল না এই শতেক যাত্রীর মধ্যে। বাপ মেয়ে চালিয়ে গেলেন যথাবিধি।

খাওয়া দাওয়া সেরে ইলোরা গেল নিজের কেবিনে। অনিরুদ্ধ-জয়ন্ত তাঁদের কেবিনে। কিন্তু—

কিন্তু একি ? বাইরে থেকে তালা দিয়ে গিয়েছেন তাঁরা। সে তালা ভাঙা। দরজা! দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। এ ওঁর মুখের দিকে তাকায়—উনি এর মুখের দিকে।

তারপরই অনিরুদ্ধ জোর ধাক্কা দিলেন দরজায়! এক—দুই—তিন। খোলে না। নিশ্চয় চোর! ঢুকে এখন বেরোতে পারছে না। জয়ন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে প্রচণ্ড একটা লাথি কষাতে যাবে—

'খুট'। ভিতরের ছিটকিনি খোলার আওয়াজ। তারপর দরজাটা ধীরে ধীরে ফাঁক হতে লাগল। আর ক্রমশ প্রকাশিত হতে লাগল চোখেমুখে শয়তানি হাসি মাখা রতন পাকড়াশির মুখ।

অনিরুদ্ধ—জয়ন্তের দু'জনেরই মনের চিন্তা তখন একই ধারায় প্রবাহিত। 'দেখেছ! কতটা ধূর্ত। ও তার মানে চুপিসাড়ে জাহাজে উঠেছে। কানুর কথা বিশ্বাস করে নি। কোন গোপন জায়গা থেকে কেবিনটাও লক্ষ্য করেছে। তারপর-তালা ভেঙে—।

রতনকে প্রায় ধাক্কা দিয়েই জয়ন্ত ঢুকল। হ্যাঁ যা ভেবেছে। বাক্স-স্যুটকেস মায় নতুন বেরোন এক ধরনের ছোট শক্ত হাতে ঝোলানো আধুনিকতম এ্যাটাচিকেস—সেটাও ভাঙা। ওরই মধ্যে ছিল একটা ভেলভেটের বাক্সে সেই অমূল্য রত্নহার। বাক্সটা খোলা।

আর তখনই—জয়ন্ত নিজেকে সামলাতে পারল না—রতন পাকড়াশির চোয়াল লক্ষ্য করে গদাম করে ঘুষি চালিয়ে দিয়েছিল।

এপার

অনেকক্ষণ সময় চলে গেছে। কেবিনের বাঙ্কে কাত হয়ে ভেবেই চলেছে জয়ন্ত। চুরুট নিভে গেছে কখন আপনা থেকেই। আলতো ভাবে স্পর্শ করে ইঙ্গিতে ওকে ডাকলেন অনিরুদ্ধ। জয়ন্ত তাকিয়ে দেখল, ভেলভেটের বাক্সে বন্দী হয়ে রত্নহার এবং তুলোট কাগজের চিঠিটা আবার অন্তর্হিত হয়েছে এ্যাটাচি কেসের মধ্যে।

জয়ন্ত উঠে বসল বাঙ্কের উপর।

প্রথমেই নজর পড়ল আবার সেই রতন পাকড়াশির উপর। মুখের মধ্যে অনুগত ভৃত্যের ভাব এনে বিনীতভাবে বসে রয়েছে, যেন এইভাবেই চিরকাল বসে থাকে জয়ন্তের নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষায়। মাথাটা আবার গরম হয়ে উঠতে চাইছে।

অনিরুদ্ধের চোখে চোখ পড়ল। অনিরুদ্ধ এ কদিনে জয়ন্তের মনের গতি বোঝার ক্ষমতা আয়ত্তে এনে ফেলেছেন। জয়ন্ত পাছে আবার কিছু বলে ফেলে, তাই নিজেই বললেন, 'তা ইনস্পেক্টর সাহেব আপনি কি করতে চাইছেন এখন?'

রতন আবার উঠে দাঁড়াল। 'যদি প্রিন্স অনুমতি দেন।'

জয়ন্তকে ঠেকানো গেল না। জয়ন্ত প্রায় ধমকের ভঙ্গিতেই বলল 'প্রিন্স! কে এখানে প্রিন্স! আর প্রিন্স বলছেনই বা কেন আপনি?'

'প্রিন্স আপনি। প্রিন্স জয়ন্ত আদিত্য। আর প্রিন্স বলছি ওই তুলোট কাগজেরই সুবাদে। বিদ্যে আমার হয়তো বেশীদূর নয়, কিন্তু ওই তুলোট লিপি থেকে যতটা পাঠোদ্ধার করতে পেরেছি তাতে এইটুকু বুদ্ধি অন্তত আমার আছে যে, রাজা শশাঙ্কের অষ্টম বংশধর আনন্দাদিত্যের সাক্ষাৎ বংশধর আপনি, নাহলে কেন এই অর্ধমণিহার আর তুলোট কাগজ আপনার অধিকারে আসবে, কেনই বা আপনি পাড়ি দেবেন দূর সমুদ্র যাত্রায় হাজার বছর আগের নিরুদ্দিষ্ট ললিতাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত নবরাজ্যের সন্ধানে? রাজার বংশধরকে রাজপুত্রই বলে, আর তারই ইংরেজী সম্বোধন প্রিন্স! আমি তো সেক্ষেত্রে অন্য কোন সম্বোধন করে আপনাকে অসম্মান করতে পারি না প্রিন্স—যদিচ প্রাথমিকভাবে আমি একটা ঘোরতর অন্যায়ই করে ফেলেছি নিশ্চয়।'

নাঃ। অসাধারণ ধুরন্ধর এই রতন পাকড়াশি। পুলিশী প্যাঁচ ওর প্রত্যেকটি কথার মধ্যেই, যদিও সাধারণ কানে ওর এই দীর্ঘভাষণ খুবই নিস্পাপ ও বিনীত।

'বুঝলাম জয়ন্ত প্রিন্স! এবং সেই প্রিন্স অনুমতি দিলে আপনি কি করতে চান?'

'আপনি পৃথিবী বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভূপর্যটক ডঃ অনিরুদ্ধ বোস-আপনি চলেছেন প্রিন্সের অভিভাবকরূপে; সেটাই আপনার মতো উদার গবেষক ও আবিষ্কারকের পক্ষে স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে আমাকে সুযোগ দিলে আমি হতে চাই প্রিন্সের এই অভিযানে প্রথম সৈনিক।' বলতে বলতে দাঁড়িয়ে উঠে—আরেক প্রস্থ স্যালুট ঠুকল রতন।

'সৈনিক!' বিস্ময়ের সুর এবার অনিরুদ্ধের কণ্ঠেও।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনারা চলেছেন আফ্রিকায়। নিশ্চয় বর্তমান আফ্রিকার স্বাধীন কোন রাজ্যের রাজধানীতে বসে নেই প্রয়াত রাজা ললিতাদিত্যের বংশধররা। তাঁদের খুঁজতে হবে নিশ্চয় কোন গভীর

অরণ্যের গহন প্রদেশে। আর তাই যদি না হবে আপনার প্রথমবার আফ্রিকা পর্যটনেই আপনি সে রাজ্য খুঁজে পেতেন।'

অনিরুদ্ধ ভাবলেশহীন। বুঝলেন তাঁর খোঁজ খবরও রাখে এই পুলিশ অফিসারটি। পুলিশ অফিসার হিসেবে অবশ্য সেটা তার কর্মকুশলতারই পরিচয় দেয়, যদিও এক্ষেত্রে ওঁদের সে কথা যতই না ভালো লাগুক।

একবার বাকী দু'জনের দিকে নজর বুলিয়ে নিয়ে রতন বলে চলেছে, 'আর সেই গহন-গভীর জঙ্গলে লোকবল নিশ্চয় প্রিন্সের প্রয়োজন। কোথায় কতরকম বিপদ ওত পেতে থাকে। সেখানে এই নগণ্য রতন পাকড়াশি অন্তত দু'-একটা সিংহ মেরেও সাহায্য করতে পারবে। আর যদি বলেন আমার স্বার্থ! প্রিন্স সেই স্বাধীন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁর সেনা বাহিনীতে কি আমার একটা যোগ্যতর স্থান হবে না?' শেষের দিকটায় গলায় এমন একটা আকুতির ঢেউ খেলিয়ে দিল রতন যে আরেকবার এদের ধারণাটা জোরদার হল যে মঞ্চে যোগ দিলে রতন সত্যিই নাম করতে পারত।

অনিরুদ্ধই আবার প্রশ্নটা তুললেন—'কিন্তু আপনার পরিবার—চাকরি!'

'পরিবার'—হা—হা করে হেসে উঠে রতন পাকড়াশি উত্তর দিল 'বিয়ে করিনি স্যার, ফলে পরিবার বলতে কিছুই নেই। আর বাদ বাকী আত্মীয়স্বজন যারা আছে তারা আমার খোঁজ না পেলে এক দিনের বেশী দু'দিন বাসভাড়া খরচ করবে না।'

'কিন্তু চাকরি?' অনিরুদ্ধ আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

'কিছুক্ষণ বাদেই ডায়মণ্ডহারবার থেকে একটা তার যাবে হুগলীর পুলিশ সুপারের কাছে—দুর্দান্ত এক দস্যুর পিছু নিয়েছে ইনস্পেকটর রতন পাকড়াশি। পরে বিস্তৃত খবর যাচ্ছে—যদিও সে বিস্তৃত সংবাদ আর কোনদিন পৌঁছোবে না। নিয়মমাফিক কিছুকাল বাদে রতন পাকড়াশিকে পুলিশ দপ্তরও ভুলে যাবে।'

বোঝা গেল। রতন নাছোড়বান্দা। যাবেই সে। এখন একটা পরামর্শ করা দরকার।

রতনকে ভিতরে রেখেই দু'জনে বেরিয়ে ইলোরার কেবিনে এলেন।

জয়ন্ত এককাট্টা। না রতনকে নেওয়া চলবে না। ওকে আদৌ বিশ্বাস করা যায় না।

বিশ্বাস যে ওকে করা যায় না, সেটা ইলোরাও একমত। অনিরুদ্ধ ওরই মধ্যে একটু দোনামোনা ভাব। বিদেশে অসহায় অবস্থায় কেই বা কার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে—করে তার লাভটাই বা হবে কি? বরঞ্চ বিদেশে ওই রকম বিপজ্জনক পরিবেশে পারস্পরিক নির্ভরতাই তৈরি করে, তৈরি করে দেয় বন্ধুত্বের পরিমণ্ডল। সুতরাং ওকে নেওয়া যেতে পারে। পরন্তু—না নিলে রতন অনেক ঝামেলা পাকাতে পারে। ক্যাপ্টেনকে গিয়ে বললে যতই কেননা তানাজীর একটা শ্রদ্ধার ভাব এসে থাকুক অনিরুদ্ধর উপর, জয়ন্তের পাসপোর্টের বিষয়টা নিয়ে জলঘোলা হলে তিনিও রতনের পক্ষ নিতে পারেন; ডায়মণ্ডহারবার কেন, ভারত না ছাড়া পর্যন্ত রতন তার পরিচয়পত্র দিয়ে জাহাজ থেকে জয়ন্তকে নামিয়ে নিতে পারে, আর তাহলেই সব শেষ।

রতনের আর্জি মঞ্জুর—সেটা জানিয়ে দেওয়ার সময়ে ইলোরা পরিচয় করে নিল রতনের সঙ্গে। দু-চারটে প্রাথমিক কথাবর্তা বলে ইলোরা নিজের কেবিনে চলে যাওয়ার সময়ে ওর মালপত্রের সঙ্গে রাখা একটা কিট ব্যাগ যেটা একটা বাঙ্কের এককোণে পড়েছিল—সেটা শুধু তুলে নিল।

সকলে তখন জিনিসপত্র গোছগাছ করছে। দীর্ঘ দেড়মাসের যাত্রা—সংসারই একটা। তার উপর নতুন একটা লোক ঢুকল—তার ব্যবস্থা, এ নিয়েই ব্যস্ত সবাই। ইলোরার কিট ব্যাগের দিকে তাই কারোরই নজর দেওয়ার অবকাশও তখন ছিল না।

বার

দীর্ঘ দেড়মাস। ক্লান্তিকর একঘেয়ে সমুদ্র যাত্রা। উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটেনি তেমন। কেবল বহুকষ্টে রতনের মুখে 'প্রিন্স' সম্বোধনটা বন্ধ করেছে জয়ন্ত। রতন তবু কেবল জয়ন্ত বলে তাকে সম্বোধন করতে নারাজ। কায়দা করে রাজাদিত্য বলে ডাকে। ইলোরার সঙ্গে সম্পর্কটা যেন—ইলোরা তার নিজের বোন। 'বোনটি' ছাড়া আর কোন সম্বোধন নেই। আর অনিরুদ্ধ! জয়ন্তের মতোই সেও স্যার বলেই ডাকে ওঁকে।

দেড়মাস বাদে জাহাজ এসে থামল, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে 'জাইরি'র মুক্ত বন্দর 'বানানা'তে। এখানে নামাই সুবিধে—এটাই অনিরুদ্ধর অভিমত। তাঁদের কাগজপত্রে যে একটু অসুবিধে আছে সেটা সারিয়ে নেবেন তিনি এখান থেকেই। যদিও স্বাধীন এ্যাঙ্গোলার ক্যাবিণ্ডা বন্দরে নামলে কষ্ট আরেকটু কম হত।

তা অনিরুদ্ধর ক্ষমতা এবং দূরপ্রসারী প্রভাব সকলকেই অবাক করছে। দেখা গেল বানানাতেও চেনে অনিরুদ্ধকে এ রকম দু'-একজন প্রভাবশালী মানুষ আছেন। বানানাতে রতনের জন্যও চারপ্রস্থ জামাকাপড় কিনতে হল। বেচারী এদের তুলনায় খর্ব, ফলে বড় কষ্টে এসেছে এই দেড়মাস। রতনের জন্য একটা ছাড়পত্রেরও ব্যবস্থা অনিরুদ্ধ বানানাতেই বসে করলেন।

বানানাতে নামার কথা ছিল চারজনের। কিন্তু নামল ছ'জন। কানু-বাসু আর সঙ্গ ছাড়েনি জয়ন্তদের। চট্টগ্রামের মানুষ ওরা—অন্তর থেকেই ভালোবেসে ফেলেছে জয়ন্তদের। ওরাও যখন অনিরুদ্ধকে এসে ধরল—'কি আর করা।' এই বলে তাদেরও সঙ্গে নিলেন অনিরুদ্ধ। অতএব বানানাতেও তাদের জন্যও কিছু ব্যবস্থা করতে হল অনিরুদ্ধকে। দিন চারেক বানানাতে কাটিয়ে ওঁরা ক্যাবিণ্ডাতে এসে উঠলেন সমুদ্র পথেই।

ক্যাবিণ্ডা থেকে আরও কিছু জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে হবে। ক্যাবিণ্ডা থেকে ওঁরা এলেন স্বাধীন কঙ্গোর রাজধানী ব্র্যাজাভিল এ। এখানেই কাগজপত্র দেখিয়ে কঙ্গোনদীর ওপারে কঙ্গো সাধারণতন্ত্র বা কঙ্গো—কিনসাসা, আগে যেটা বেলজিয়ানদের অধীনে ছিল তার রাজধানী কিনসাসা (আগের নাম লিওপোণ্ডভিল) আসতে হবে। আগেকার মতো ব্যাপারগুলো অত সহজ সরল নেই যে, অভিযাত্রীরা যখন তখন ঢুকে পড়বে 'অন্ধকার মহাদেশ' এই অপব্যাখ্যা দিয়ে। এখন সমগ্র আফ্রিকা ছোট বড়ো অসংখ্য স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত। দুই কঙ্গোই স্বাধীন এখন। ফরাসী উপনিবেশও স্বাধীন ; বেলজিয়ান উপনিবেশও স্বাধীন।

ব্রাজাভিলে এসে সরকারী দপ্তরে দেখা করলেন প্রথম অনিরুদ্ধ। ওপারে কিনসাসাতে যাবেন।

ছাড়পত্রগুলো নিতে হবে এখান থেকেই।

ব্রাজাভিলের সরকারী দপ্তরে এসে অভ্যর্থনা ঘরে বসে থাকা কঙ্গোলী মহিলা জানালেন ওখানকার সর্বোচ্চ অধিকর্তা মি. লুয়াগার সঙ্গে তাঁদের দেখা করতে হবে। ব্যবস্থা করে দিলেন ভদ্রমহিলা। কিন্তু ঘরে ঢুকতেই কঙ্গোলী ভদ্রলোক বিশুদ্ধ ইংরেজীতে যখন প্রায় হৈ হৈ করেই অনিরুদ্ধকে অভ্যর্থনা জানালেন তখন অন্যেরা দূরে থাক, অনিরুদ্ধও অবাক। ভদ্রলোক অনিরুদ্ধের সমবয়সীই হবেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'আপনি আমাকে না জানতে পারেন তবে আমি আপনার কথা জানি' ; বলতে বলতেই বেল টিপলেন ভদ্রলোক। কফি এল মুহূর্তের মধ্যে। ফোনে ডেকে পাঠালেন তিনি কাকে যেন। ঘরে এসে ঢুকল যে তরুণ যুবকটি তাকে দেখে কিন্তু সকলেই বিস্মিত। পরিচয় করিয়ে দিলেন লুয়াগা সাহেব। 'এঁর নাম—'

তরুণটি নিজে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সকলের সঙ্গে করমর্দন করতে করতে নিজেই নিজের নামটি বলল, আমার নাম 'স্থূথি নোয়াবিন'।

কিন্তু এঁরা বিস্মিত হলেন কেন ?

নোয়াবিন আফ্রিকান নয়। তার চামড়া দিয়ে যে শ্বেতবর্ণের আভাস পাওয়া যাচ্ছে সেটা ইওরোপীয়ানদের মতো সাদাও নয়—বরঞ্চ তুলনা করা চলে খানিকটা জয়ন্তের গায়ের রঙের সঙ্গে।

ওদের অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকার ভঙ্গিকে কিন্তু কেমন যেন অগ্রাহ্যই করল নোয়াবিন।

নোয়াবিনই প্রথম কথা বলল, সুরে কি রকম একটা সন্দেহ। আপনি ড. অনিরুদ্ধ বোস। আমার স্মৃতি যদি না ভুল করে থাকে আপনি তো একবার কি যেন আবিষ্কারের জন্য আফ্রিকায় এসেছিলেন।'

লুয়াগা প্রায় তাকে থামিয়েই দিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন—'হ্যাঁ—ইনিই সেই ড. অনিরুদ্ধ বোস। ইণ্ডিয়া থেকে আসছেন। তুমি চার নম্বর আলমারির তিন নম্বর তাকে চোদ্দ নম্বর ফাইলে ওঁর সব পরিচয়ই পাবে।'

অবাক হলেন অনিরুদ্ধও। অন্যেরা তো বাকরুদ্ধ।

নোয়াবিন আবার বললেন—'ফাইলটা আমার পড়া স্যার। সেবার ওঁর সঙ্গে ছিলেন ভূপর্যটক বেন হার্ডলি। তা যাইহোক এবার ডঃ বোস কি সব ইণ্ডিয়ান সঙ্গীই এনেছেন ?'

অনিরুদ্ধ বললেন 'হ্যাঁ।'

'তা এবার উদ্দেশ্যটা কি আপনার ? কিসের অভিযান ?'

'সেটা বলা কি আপনাদের এখানে একান্তই আবশ্যক ?' অনিরুদ্ধ এবার একটু কঠিন যেন।

'কিছুটা।' নোয়াবিন হাসল। একটু বিদ্রূপ মেশানো রয়েছে সে হাসিতে। তার কারণ এখান থেকে তো আপনি যাবেন ওপারে—ছাড়পত্রে উদ্দেশ্যটা আমাদের লিখে দিতে হবে।'

'অভিযান। এখনও তো গভীর জঙ্গলের সব কিছু আবিষ্কার হয়নি।'

'বাকীও কিছু নেই। তা-ছাড়া আফ্রিকা এখন নানান স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত—'

'সেটা আমি জানি।'

'সুতরাং নানান ধরনের রাজনৈতিক অসুবিধা আছে। দ্বিতীয়ত— আপনারা একটা সীমানার আগে কোন প্রাণী শিকার করতে পারবেন না।'

'তাও জানি।'

'তাহলে এই অহেতুক কষ্ট নিচ্ছেন কেন?'

জয়ন্ত চটছে। ছেলেটা অহেতুক বাগড়া দিচ্ছে। ইলোরা চুপ করে বসে আঙুলের নখ খুঁটছে। রতন একবার নোয়াবিনের মুখ দেখছে একবার লুয়াগার একবার অনিরুদ্ধর। লুয়াগাও বেশ অস্বস্তি বোধ করছেন যে, সেটা বোঝা যাচ্ছে ওঁর মুখভাবে।

এবার অনিরুদ্ধ মুখ খুললেন। 'আপনাদের আইনে যদি কোন বাধা থাকে তবে আমাদের অভিযান আটকান। না হলে যা করার তা করে আমাকে ছাড়ুন। আপনারা অনুমতি না দিলে আমাকে অন্য ব্যবস্থা দেখতে হবে।'

'কি ব্যবস্থা দেখবেন?' নোয়াবিনের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন।

'আপনাদের এই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কিংবা স্বয়ং প্রেসিডেন্টের সঙ্গেও দেখা করতে পারি। আপনি অনিরুদ্ধ বোসকে ঠিক ভাবে না চিনতে পারেন—ওঁদের কেউ কেউ বোধহয় পারবেন।'

নোয়াবিন উঠল। অনেকটা বাধ্য হয়েই যেন। শুকনো গলায় বলল, 'আসুন।'

নোয়াবিন ও অনিরুদ্ধ চলে গেলেন। বাকী তিনজন লুয়াগার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অভ্যর্থনা কক্ষে এসে বসল।

বেশ সময় নিল নোয়াবিন। অনেকক্ষণ ধরে আতস কাঁচ দিয়ে ছাড়পত্র গুলো পরীক্ষা করল, বিশেষ করে জয়ন্তের টা। উঠে চলে

গেল পিছনের একটা ঘরে। দীর্ঘ দশ মিনিট বাদে ফিরে এল। অনিরুদ্ধ কেবল ওর ভাব গতিক লক্ষ্য করছিলেন।

অবশেষে সংক্ষিপ্ত ভাষায় একটা অনুমতি পত্র লিখল নোয়াবিন। এই অনুমতি দেওয়ার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নোয়াবিনই। অনুমতিপত্রটা যথাবিধি সই সাবুদ হওয়ার পর, নোয়াবিন যেন একটু বিনীত।

'আপনার অতীত প্রয়াস আমি জানি ড. বোস। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি চারপাশেই খুব জটিল—সেইজন্যই।'

'ধন্যবাদ।' করমর্দনের জন্য হাত বাড়ালেন অনিরুদ্ধ। হাতে হাত লাগিয়ে অনিরুদ্ধই প্রশ্ন করলেন—'একটা কথা জিজ্ঞাসা করার অনুমতি যদি দেন—'

'বলুন।'

'আপনার গায়ের রঙ্ না ইওরোপীয়দের না আফ্রিকাবাসীদের'।

কথাটা শেষ হতে দিল না নোয়াবিন। 'এই জন্যই আমি বিদেশী পর্যটকদের মনে মনে পছন্দ করি না।' গলার স্বরটায় যথেষ্ট অভদ্রতা। 'আমার জন্ম মিশ্র রক্তে।—এবার সন্তুষ্ট তো—!' এক কথায় বিদায় সম্ভাষণ জানাল নোয়াবিন।

অনিরুদ্ধ বেরিয়ে এলেন। বাইরে ভাড়া করা দু'টো গাড়িতে
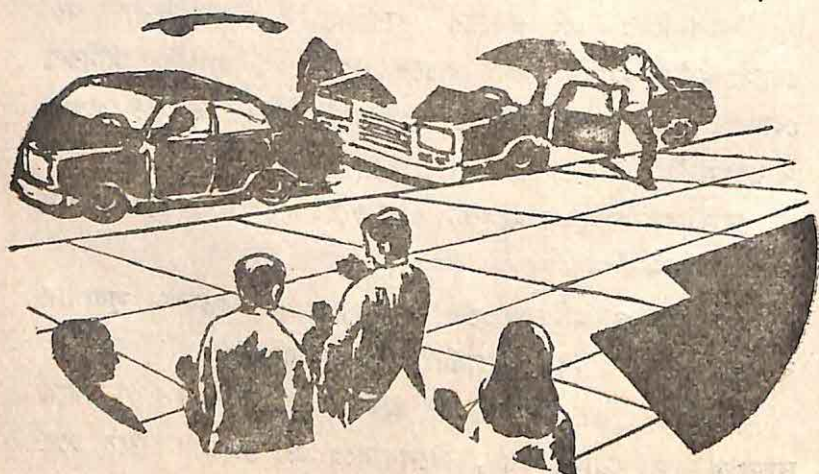
মালপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছে কানু-বাসু। ওঁরা চারজন এসে গাড়িতে উঠলেন।

দুপুরের খাওয়া দাওয়া সারতে হবে। গাড়ি ছুটিয়ে দিলেন হোটেলের উদ্দেশে।

কেবল খেয়াল করলেন না নোয়াবিনের ঘর থেকে একটা দূরবীন তাঁদের লক্ষ্য করছে।

* * *

পরের দিন—কিনসাসা।

আশ্চর্য! এরকম সংকর জাতির কত মানুষ এই সব দপ্তরে কাজ করে চলেছে!

এখানে যাঁর কাছে কাগজপত্র দেখাতে হল ভদ্রলোকের ব্যবহার কিন্তু নোয়াবিনের বিপরীত। যদিও গায়ের রঙ একই রকম।

অনিরুদ্ধ গবেষক। তাঁর চোখে যেন কি একটা আভাস ইঙ্গিত দিয়ে উঠল, যখন তিনি রুয়াম বর্জি বলে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বললেন।

রুয়াম কিন্তু অমায়িক। অনিরুদ্ধকে উৎসাহিতই করলেন বরঞ্চ। আফ্রিকার গহন জঙ্গলের কোন পর্যন্ত সরকারী অভয়ারণ্য মানচিত্র খুলে তাও দেখিয়ে দিলেন। শিকার নিষিদ্ধ এখানে – নেহাত প্রাণের দায় না পড়লে।

অনিরুদ্ধ দেখলেন—বললেন না কিছুই।

রুয়াম ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখলেন। এসে ওঁদের গাড়িতে তুলে দিলেন।

অনিরুদ্ধের যাত্রা শুরু হল। দুটো ভ্যান গাড়ি তাঁরা ভাড়া করেছেন। যতদূর পাকা রাস্তায় যাওয়া যায়।

অনিরুদ্ধরা প্রথম থামবেন কোয়াঙ্গোতে। খুব একটা দূর নয় এখান থেকে জায়গাটা। তারপর দীর্ঘ যাত্রা। আপাতত গাড়ি ছাড়ার দরকার নেই।

অনিরুদ্ধর মতে একেবারে বিষুবরেখার উপর যেখানে কঙ্গো নদী

এবং রুকি বুসিরা নদীর সঙ্গম সেখান থেকে অদূরবর্তী কোকুইলহাটভিলি শহরে এসে তবেই তাঁরা অভিযানের অন্যান্য ব্যবস্থা করবেন।

মনের আনন্দেই আছেন ছ'জন।

ইলোরা তার যাত্রাপথের দু'ধারের ছবি তুলে চলেছে। রতন মনের আনন্দে গান গেয়ে চলেছে—গলায় তার রাসভ সুর—অন্যের কান যে এতে বধির হবার উপক্রম তাতে তার গ্রাহ্যও নেই। অনিরুদ্ধের সঙ্গে সেই খাতাটা—পড়ে যাচ্ছেন—নতুন কিছু কাগজপত্রও আছে—সে গুলোও দেখছেন।

কেবল জয়ন্ত সারাটা পথ কেমন যেন চুপচাপ। জয়ন্ত চুপচাপ কেন?

নোয়াবিনকে দেখেছে জয়ন্ত, তার কথা শুনেছে। রুয়ামকে দেখেছে জয়ন্ত, তারও কথা বার্তা শুনেছে। কিন্তু। কিন্তু কোয়াঙ্গোতে তাদের হোটেলে সে যে একই ধরনের একটি লোককে ঘোরা ফেরা করতে দেখেছে সেটা সে কাউকে বলেনি। অনিরুদ্ধকে বলবে বলবে করেও—বলা হয়ে ওঠে নি।

লোকটি হোটেলের একটি ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুতপায়ে হেঁটে যখন যখন লিফটে উঠছিল তখনই দেখেছে সে। ঘরের নম্বরটা দেখে কায়দা করে হোটেলের অভ্যর্থনাকারিণীর কাছ থেকে নামটাও জেনেছে। জয়ন্তের চেহারাটা দেখেই বোধহয় ভদ্রমহিলা অহেতুক হলেও জয়ন্তের কৌতূহলটা মিটিয়েছিলেন। ভদ্রলোকের নাম ক্রাম সুয়ান। এই হোটেলে উঠেছেন তাদের ঠিক দু'ঘণ্টা আগে।

কোয়াঙ্গো ছেড়ে অনেকদূর চলে এসেছেন বোস সাহেবের দলবল। একটা গাড়িতে সেদিন অনিরুদ্ধ ও জয়ন্ত পাশাপাশি।

'এত গম্ভীর কেন—জয়ন্ত?' অনিরুদ্ধ প্রশ্ন করলেন।

'জয়ন্ত একটু হেসে বলল—'কিইবা বলব? আমার কাছে এটা তো এখনও সেই বুনো হাঁস ছাড়া কিছু মনে হচ্ছে না।'

'তাই কি?'

'তাছাড়া আর কি বলুন? একে তো কিছু আছে কি না কে জানে তার উপর—'

'তার উপর?'

'না। কিছু না'। জয়ন্ত চুপ করল। অনিরুদ্ধও চুপ করলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অনিরুদ্ধই বললেন একটা চুরুট ধরিয়ে, 'প্রথমে নোয়াবিন—তারপর রুয়াম বর্জিকে যদি বা হজম করতে পারছ—পারছ না ক্রাম সুয়ানকে। প্রায় একই ধরনের সংকর বর্ণের লোক এরা, তাই নয়?'

জয়ন্ত চমকাল না। তার চোখে যেটা ধরা পড়েছে অনিরুদ্ধের চোখে তা ধরা পড়তেই পারে।

'এরা ঠিক কি ধরনের সংকর? শুনেছি বাঙালীরাও সংকর—অর্থাৎ মিশ্রিত জাতি—ভিন্ন রক্ত ধারাব মিশ্রণ আছে আমাদের রক্তে।'

'জান ঠিকই। তবে এরা কি কি ধরনের রক্তের মিশ্রণে এ রকম চেহারা পেয়েছে সেটা নোয়াবিনের ব্যাখ্যাকেই আপাতত সঠিক বলে মনে করে নিতে হবে। তাছাড়া এ রকমটা তো হতেই পারে।'

জয়ন্ত চুপ করল।

অনিরুদ্ধও চুপ করলেন। যদিও জয়ন্তের সন্দেহটাকে তিনি ধামাচাপা দিতে চেয়েছেন, সন্দেহের একটা পিন তাঁকেও খোঁচা মারছে। কিন্তু কি ধরনের সন্দেহ! জানা নেই যে তার সঠিক চেহারাটা অনিরুদ্ধেরও। কেউ কি নজর রাখতে চাইছে তাঁদের গতিবিধির উপর!

তের

দুরবীনটা দিয়ে যতদূর দেখা যায় দেখে নিল নোয়াবিন। স্ফূর্তি নোয়াবিন। তারপরই বেরিয়ে এল তার অফিস থেকে। দ্বিপ্রাহরিক আহারের ছুটি।

কিন্তু গাড়িটা ছুটল শহরতলীর দিকে। এখানে ওখানে এখনও কিছু কিছু উপজাতির ফেলে যাওয়া কুঁড়ে ঘর রয়েছে শহরের প্রান্তে। সে রকমের একটি ঘরে এসে ঢুকল নোয়াবিন। ঘরটা একদম খালি নয়। একজন বৃদ্ধ পিগমী উপজাতির মানুষ বাস করে। না—বন্য নয়। বেশ শহুরে হয়ে গেছে এই মানুষটি। নিঃশব্দে দরজা খুলে দিল বৃদ্ধ, বিশেষ একটা করাঘাত শুনে। নোয়াবিনকে দেখে কোন কথাই বলল না। কেবল ঘরের খিড়কির দরজাটা খুলে দিল। ভিতরে আরো একটি ছোট্ট ঘর। একটা বাক্স রয়েছে ঘরটায়। নোয়াবিন সাবধানে বাক্সটা খুলে যেটা বার করে আনল তাকে বলে রেডিও ট্রান্সমিটার—বেতার বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র।

ওপাশ থেকে সাড়া পাওয়ার পর গড়গড় করে নোয়াবিন কাকে কি যেন বলল। ভাষাটা পিগমী বৃদ্ধ শোনে না—তার শোনাটা কাজও নয়। শুনলেও ভাষাটা সে বুঝত না আদৌ।

আধঘণ্টা বাদে নোয়াবিনের গাড়ি আবার ফিরে এল তার কর্মস্থলে।

তখন তার মনের মধ্যে একটাই চিন্তার ঝড়। সত্যি কি কিছু ঘটতে চলেছে না সবটাই ভাঁওতা। কিন্তু চিন্তা ছাড়া তার এখন কি-ই বা করার আছে: নির্দেশের প্রতীক্ষা ছাড়া।

কিনসাসাতে খবর দেওয়া পর্যন্ত তার কর্তব্য ও অধিকার, তার বেশী নয়। এখন কেবল অপেক্ষা করা—অপেক্ষা।

* * * *

হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে অনিরুদ্ধদের বিদায় দিলেন রুয়াম বর্জি। যতক্ষণ দৃষ্টির মধ্যে ছিল গাড়ি দু'টো ততক্ষণই রুয়াম বর্জি একভাবে খাড়া দাঁড়িয়ে রইলেন। বর্জির মতো একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে এভাবে পথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে যে কেউই অবাক হবে সে কথাটাও এই মুহূর্তে বর্জির মনে এল না! সম্বিৎ ফিরে এল

যখন রাস্তার ওপার থেকে প্রায় একই রকমের এক তরুণ পথ পেরিয়ে রুয়ামের পাশে এসে দাঁড়াল।

'মিঃ বর্জি'—আগন্তুকের কণ্ঠস্বরে রুয়াম চমকে উঠলেন।

'এ কি ? তুমি এখনও এখানে ?' রুয়ামের গলায় যতটাই বিরক্তি ততটাই ক্রোধ।'

'রাগ করবেন না। একটা ফ্যাসাদে পড়ে আটকে পেছি—তবে কাজে গাফিলতি হয়নি।'

'ভেতরে এস'। বর্জি আর একটি কথাও না বাড়িয়ে আগন্তুককে নিয়ে এসে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আগন্তুকের একেবারে মুখোমুখি। বর্জির থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে যুবক একটু ম্লান হেসে বলল, 'বিশ্বাস করুন আপনার পাঠানো খবরের পর আমি এক সেকেণ্ডও দেরি করিনি—কিন্তু বিধি বাম। বাইকটা বিগড়ে গেল।'

'বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না ?' চাপা গর্জন বর্জির।

'করেছি। এরা কোয়াম্বোতে পৌঁছোবার অনেক আগেই ক্রাম স্থ্য়ান ওখানে পৌঁছে যাবে।'

'তোমার কথা আপাতত বিশ্বাস করলাম ; কিন্তু কাজের মধ্যে যদি কোন গলতি থাকে, ক্ষমা চাইবার সুযোগটুকু পর্যন্ত আমাদের থাকবে না, সেটা জানা আছে নিশ্চয় !'

'আছে। আমার বাইক ঠিক হয়ে গেছে। কাজের ছকে যে পরিবর্তনটা ঘটেছে সেটুকু জানানোর জন্যই আমি এসেছি, মিঃ বর্জি।'

'শুনি পরিবর্তনটা।'

'আমি রওনা দিচ্ছি কোকুইলহাটভিলির দিকে। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন ; ওদের আগেই পৌঁছোব।'

'তোমার সৌভাগ্য কামনা করা ছাড়া এই মুহূর্তে তো আমার কিছু করার নেই দেখ্‌বে।'

উঠতে উঠতে পল দেস্থবে কেবল জিজ্ঞাসা করল—'আমি কতদূর পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারি !'

'দেস্থবে ! দেখা এবং অপেক্ষা করা ছাড়া এ পর্যন্ত আমার কাছে কোন নির্দেশ নেই। একই কথার পুনরাবৃত্তি করা ছাড়া আমারও দ্বিতীয় কোন কথা নেই। যাক তুমি আর দেরি কর না।'

নিঃশব্দে পল দেস্থবে বেরিয়ে গেল।

বর্জি—দেস্থবের কথোপকথনের ভাষা আর নোয়াবিনের ভাষা কেউ যদি শুনত— ! ভাষাটা কোথাকার !

* * * * *

অনিরুদ্ধদের গাড়ি দু'টো তখন কোকুইলহাটভিলির দিকে চলেছে। পথটা এক জায়গায় বেশ সঙ্কীর্ণ আর তখন পিছন থেকে একটা বাইকের হর্ণ বারবারই পথ ছাড়ার জন্য অনুরোধ জানাতে লাগল। অনিরুদ্ধের ড্রাইভার—কঙ্গোবাসী একজন দক্ষ গাড়িচালক। ইচ্ছে করলেই পথ দিতে পারে সে, কিন্তু তার যেন জেদ চেপে গেছে। কিন্তু অনবরত হর্ণের আওয়াজ অনিরুদ্ধকে বিরক্ত করছিল, তিনি ড্রাইভারকে বললেন পথ দিতে।

নেহাত গাড়ির সওয়ার অনিরুদ্ধ গাড়িটি টাকা দিয়ে ভাড়া নিয়েছেন, ড্রাইভার তাঁর কথা মতোই পথ দিল, কিন্তু বিরক্তি তার সমস্ত মুখে।

দু'টো গাড়িকেই বাইকটি প্রচণ্ড গতিতে অতিক্রম করে গেল। আরোহীর মুখটা অনিরুদ্ধরা দেখতে পেলে চমকে উঠতেন। কিন্তু অনিরুদ্ধ বা জয়ন্ত না দেখলেও ড্রাইভার তার সামনের আয়নার ছায়ায় একঝলক যা দেখেছে তাতে তার মাতৃভাষায় মুখ দিয়ে একচোট গালা-গালিই বুঝি বা বেরিয়ে এল। অনিরুদ্ধ একটু বিস্মিত হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন—'কি হল ?'

'জানেন না স্যার। আপনাদের মতো অভিযাত্রীদের নিয়ে আমি এ রকম কয়েকবারই এসেছি—প্রতিবারই দেখি এক ধরনের লোক—

অভিযাত্রীদের অনুসরণ করে। এই বাইকম্যানের মুখটাও সে রকমই মনে হল।'

'তাই নাকি?' অনিরুদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন তবে ভঙ্গিটা নিরাসক্ত। হতেই তো পারে। দেশ এখন স্বাধীন। অনেক রকম রাজনীতির ওঠা নামা চলে আফ্রিকার এই দেশগুলিতে—হয়তো সরকারী চরেরা অনুসন্ধানে থাকে—। উদ্দেশ্য সব অভিযাত্রীর তো সমান হয় না।

কিন্তু জয়ন্ত এতো সহজে অনিরুদ্ধের সঙ্গে একমত হতো কি না সন্দেহ যদি অনিরুদ্ধ তাঁর ভাবনাটাকে কথায় প্রকাশ করতেন।

অবশেষে তাঁরা পৌঁছোলেন কোকুইলহাটভিলিতে। এখানে একদিন বিশ্রাম। তারই মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে কিছু দেশীয় লোক যারা বনের পথ চেনে—চেনে গহীন অরণ্যের অন্ধি-সন্ধি। অভিজ্ঞ লোক চাই।

কোকুইলহাটভিলির উপকণ্ঠে পরের দিন অনিরুদ্ধ হানা দিলেন। গাড়ি দু'টো এখনও ছাড়েন নি। বিশেষ করে একজন ড্রাইভার—যে অনিরুদ্ধের গাড়ি চালাচ্ছিল—সে ভালোই জানে কোথায় কাদের পাওয়া যাবে। একটা গ্রামীয় পল্লী-প্রায়। দু-সারি কুঁড়ে ঘর। বিশেষ এক ধরনের বাঁশের খুঁটি, পামগাছের পাতার ছাউনি আর নারকেল গাছের পাতার দেওয়াল। প্রত্যেক কুটিরের সামনেই একটু করে বাগান। জায়গাটা শহরের উপকণ্ঠে—কিন্তু জঙ্গল ওপাশে উঁকি মারছে।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা দোকান থেকে—বোধহয় কফি-কোকো জাতীয় কিছু সস্তা দরে বিক্রি হয়—বেরিয়ে এল একজন আফ্রিকাবাসী। গায়ের রঙ যথাবিধি আবলুস-কালো—কিন্তু শুভ্র দন্তরাজি বিকশিত করে এসে যখন বিনীতভাবে সে দাঁড়াল—তখন তার স্বাস্থ্য দেখে এরা সত্যিই মোহিত।

মোট ষোলজন লোক দরকার। হ্যাঁ—তা পারে ষোলজন লোক যোগাড় করতে অজমাংলু। সর্দার বলে কথা। ঘণ্টা খানেক সময়

লাগল অজমাংলুর। পনেরজন লোক নিয়ে এল সে—তাদের মধ্যে বিশেষ দু'জনকে পাশাপাশি দেখে এদের চারজনের বিষম খাবার জোগাড়। একজন লম্বায় ফুট আটেক—পরে মেপে দেখা হয়েছিল—সাত ফুট সাড়ে সাত ইঞ্চি। আফ্রিকার পামগাছের মতোই লম্বা। রোয়াণ্ডা উপজাতির লোক। আরেকজন বিখ্যাত পিগমি, উচ্চতায় লোকটি চার ফুটের বেশী নয় কিছুতেই। এরা বাম্বুটি উপজাতির লোক। ভয়ঙ্কর তীরন্দাজ।

রতন একটি কথাই বলল—একেই বলে মানিক জোড়।

কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল।

পরের দিন তাঁরা যাত্রা করবেন কঙ্গো নদীর তীর ধরে।

সব ঠিক করে অনিরুদ্ধরা ফিরে চললেন নিজেদের আস্তানায়।

কেবল লক্ষ্য করলেন না এক জোড়া তীক্ষ্ণ চোখ তাঁদের নজর করছে একটা কুটিরের মধ্য থেকে। চোখ দু'টো পল দেম্বুবের।

পনের মিনিটের মধ্যে পল দেম্বুবে তার কর্তব্য সমাধা করল। বর্জির সঙ্গে কথা বলার সময়ে যে ভাষা ব্যবহার করেছিল দেম্বুবে সেই ভাষাতেই—তিন জায়গায় তিনটি খবর পাঠাল—এই কুটিরেও রয়েছে একটি বেতার সংগ্রাহক যন্ত্র।

যথাস্থানে বসে বর্জি খবর পেলেন অনিরুদ্ধরা আবার যাত্রা শুরু করছেন। যোগাড় যন্ত্র শেষ।

দেম্বুবে আর কোথায় কোথায় খবর পাঠাল!

চৌদ্দ

আর সঙ্গে গাড়ি নেই। এবার হাঁটা। চারটে গাধা মোট বহন করছে। ষোলজন আফ্রিকাবাসী। অজমাংলু তাদের সর্দার। পাশাপাশি সবসময়ে হেঁটে চলেছে দৈত্য ও বামন। জয়ন্ত তাদের রোয়াণ্ডা আর বাম্বুটি বলেই ডাকে। রতন ডাকে মানিকজোড় বলে।

অনিরুদ্ধ কথাবার্তা যা তা অজমাংলুর সঙ্গেই বলেন। প্রত্যেকটি লোকের কাঁধেই মাল। জয়ন্তের সঙ্গে সেই এ্যাটাচি কেস। রতনের কাঁধেও মাল। মায় অনিরুদ্ধেরও। ইলোরা তার সেই নিজস্ব ব্যাগ ছাড়াও মাল নিয়েছে। কান্নু-বাস্নু তো আছেই।

বেশ কিছু বল্লম জোগাড় হয়েছে। দেশীয় লোকদের আত্মরক্ষায় ওটা খুবই দরকার। ওঁদের চারজনের কাঁধে রাইফেল।

বাইশজনের অভিযাত্রী দল চলেছে। কোথাও কোথাও বাঁধানো পথ যে নেই তা নয়, কিন্তু যেতে হবে যে অরণ্যের গহীন প্রদেশে! পথ নির্দেশিকারূপে অনিরুদ্ধ বেছে নিয়েছেন কঙ্গো নদীর তীর। তাই কোথাও পথ পাচ্ছেন কোথাও কেবল জন্তু-জানোয়ারের আনাগোনার পদচিহ্ন নির্ভর করতে করতে এগোতে হচ্ছে। কত রকমের গাছ! মেহগিনি গাছ, পাম গাছ, আরও কত অজানা গাছ। গাছ সম্পর্কে অনিরুদ্ধের জ্ঞান খুব গভীর নয়। তিনি তাই সবিনয়েই রতন-ইলোরা জয়ন্তের প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছেন।

সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে হাঁটা শুরু হয়। দুপুরে ঘড়ি ধরে দু'ঘণ্টা নাওয়া-খাওয়ার জন্য সময়—আবার হাঁটা। সন্ধ্যে নামলেই—সুবিধে মতো জায়গায় তাঁবু ফেলা। তিনটে তাঁবু আনা হয়েছিল তিন জনের কথা ভেবে। এখন চারজন। বাধ্য হয়ে বড় তাঁবুটায় জয়ন্ত আর অনিরুদ্ধ থাকেন। আর থাকে মালপত্র। আরেকটাতে ইলোরা—অন্যটায় রতন।

চারপাশে আগুন জ্বালিয়ে রাত কাটাতে হয়। পাহারা থাকে পর্যায়ক্রমে। বন্যজন্তুদের বিশ্বাস নেই।

অবশেষে এমন একটা অঞ্চলে ওঁরা পৌঁছোলেন যে জায়গাটা দেখে অনিরুদ্ধ বললেন, 'এবার আমরা যাব উত্তর দিকে।'

'কিসে বুঝলেন উত্তরেই আপনার সেই স্বপ্নের রাজ্য!' জয়ন্ত প্রশ্ন করেছিল।

'কেননা এই জায়গাটায় নদীটাকে একটা বলে মনে হলেও—এটা

দু'টো নদীর সঙ্গম স্থল। এতক্ষণ এসেছি কঙ্গোর তীর ধরে, এবার নদী আবার পূব দিকে বেঁকে গেছে। ওটার নাম লুয়ালাবা। ওদিকে আমাদের গন্তব্য নয়—।'

'আপনি কি আগেরবার—?'

'হ্যাঁ! আগের পর দিক ভুল করেই ওদিকে চলে গিয়েছিলাম। তাছাড়া ওদিকে জনপদ অধ্যুষিত। ওপাশে কিছু নেই।'

কথা হচ্ছিল সন্ধ্যে বেলায় তাঁবুতে বসে।

পরের দিন সত্যি সত্যিই তাঁরা যাত্রা করলেন উত্তরের দিকে। অনিরূদ্ধ বললেন, 'এখনও আমরা কঙ্গো সাধারণতন্ত্রের মধ্যেই আছি। কিন্তু কোন জঙ্গলে যে কার সীমানা এখানে কে বোঝে।'

হাঁটছেন। ওঁরা হাটছেন। এখনও পথের ইঙ্গিত কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু জলের ইঙ্গিত নেই।

একটু প্রশস্ত পথ দেখলে রতন আনন্দিত হয়। কিন্তু অনিরুদ্ধ নয়। বলেন পথ মানেই মানুষ। মানুষ মানে জনপদ। আর জনপদ আমাদের গন্তব্য নয়।

মানচিত্র খুললেন অনিরুদ্ধ। দেখালেন—'এই দেখ আর একটু বাঁ দিক ঘেঁষে গেলেই আমরা পরপর দু'টি জনপদ পাব—একটি কোম্বা —আরেকটি পৌলিস। সুতরাং ডান দিক ঘেঁষে আরো জঙ্গলে ঢুকতে হবে।'

অতএব জঙ্গল। বাঁদিক পরিত্যাগ কর। ডানদিক ঘেঁষে চল। কিন্তু আর কতদিন—কতকাল? এদের তো কারো ক্লান্তি নেই। ইলোরা একহাতে ক্যামেরা আরেক হাতে রাইফেল নিয়ে দিব্যি চলেছে। রতন বিশাল গুলি-বারুদের মোট নিয়ে বেসুরো গলায় গান গাইছে। অনিরুদ্ধ সমানে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। আর জয়ন্ত! এক অমূল্য সম্পদ বহন করে এ্যাটাচি কেস আর রাইফেল নিয়ে চলেছে। সবথেকে গম্ভীর জয়ন্তই।

অনিরুদ্ধ কোম্বায় ঢুকলেন না। ওদের ম্যাপ দেখিয়ে বোঝালেন

এখান থেকে কয়েক মাইল বাঁ দিকে গেলেই কোম্বা—। পেরিয়ে গেলেন কোম্বা। একই ভাবে পৌলিস।

একই ভাবে দিন কাটছে; কাটছে রাত। ক্লান্তিতে জীর্ণ জয়ন্ত।

কিন্তু রাতের আঁধারে যখন নিশাচর পশুর ডাক শোনা যায়, যখন সবাই ক্লান্তিতে গভীর নিদ্রায় ডুবে থাকে—তখন এরা জানে না আশি ফুট উপর দিয়ে গাছের ডালে ডালে ছুটে চলেছে একটি বাঁদর।

'এখানে এলেন না তাঁরা'—কোম্বা অতিক্রম করে আরো গভীর অরণ্যে ঢুকলেন যখন অনিরুদ্ধ বাহিনী—রাতের অন্ধকারে বার্তা চলে গেল কোম্বা থেকে, সেখানে অপেক্ষায় ছিল একজন। কোথাও একটা খবর পাঠিয়েই সে ছুটল পৌলিস। 'না এখানেও আসেননি'—খবরটা পৌলিস থেকে পাঠানো হল আরেক রাতে।

'তাহলে সজাগ থাকতে হবে।' কোন সুদূর থেকে ভেসে আসে কণ্ঠস্বর। ভাষাটা যদি শুনতে পেত জয়ন্ত!

কোম্বা ও পৌলিসের লোকটি জানত কোথায় কিভাবে সজাগ করতে হবে—কাকে এবং কেন। এই লোকটির নাম জারবি দুয়াত।

এক রাতের অন্ধকারে জারবি ঢুকে পড়ল জঙ্গলে। হ্যাঁ অবশ্যই তাকে প্রাণ হাতে করেই ঢুকতে হয়েছে। একটা তীক্ষ্ণ শিশ। আরেকটা শিশ তার প্রতিধ্বনির মতোই বেজে উঠল যেন। বিশাল এক মহীরূহ। তলা থেকে যার উপর দেখা যায় না ঘন পাতার জন্য—সেই উপর থেকে নেমে এল দ্রুত দড়ির কপিকলে বাঁধা একটা ঝুড়ি। জারবি উঠে গেল। সেখানে বসে আছে এক পিগমি। কি কথা হল দু'জনে—দু'জনেই জানে। ছুটল এঁকটি বাঁদর। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে। এই অন্ধকারেই। গন্তব্য! সেই জানে। সকালবেলা জারবির গাছের তলা দিয়ে অনিরুদ্ধরা যখন চলে গেলেন তখন জারবির দুরবীন লক্ষ্য করছে তাঁদের।

তারও পর চারদিন চলে গেছে। অরণ্য যে এত গভীর হতে পারে

সে জানা ছিল না জয়ন্তের। বিষুবরেখার সূর্য এতদিন উত্তাপে ঘর্মাক্ত করেছে। কোট ছেড়ে সব শুধু সার্ট পরে চলেছেন তাতেও গা জ্বলে যাচ্ছিল। কিন্তু এই অরণ্য! গাছের আড়াল দিয়ে সূর্য-দেব তাঁর আলো যদি বা একটু পাঠাতে পারছেন উত্তাপহীন সেটা। মাটি স্যাঁতসেঁতে। কিন্তু কোথাও নদী নেই।

মালবাহক স্থানীয় লোকদের চোখের উপর নির্ভর করে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। জলাশয় দরকার। পশুদেরও নির্ভর করতে হয় জলের উপর। সুতরাং তাদের পায়ে চলার চিহ্ন দেখে দেখে জলাশয়ের কাছে এসে রাতের তাঁবু ফেলতে হয়। না হলে খাওয়া দাওয়া হবে কি করে!

চারদিন বাদে এক সন্ধ্যে। তাঁবু পড়েছে। ওপাশে আগুন জ্বালানো হয়েছে। জয়ন্তদের তাঁবুতে চারজন বসে রয়েছেন। ভুল বলা হল। তিনজন বসে। জয়ন্ত আধশোয়া। তার লোহা পেটানো শরীর—। ক্লান্তি নয়, অবসাদ। কোনদিনই সে বিশ্বাস করেনি এই অজ্ঞাত রাজ্যের কথা—আজ সে অবিশ্বাস আরো দৃঢ় হচ্ছে। কথাটা সেই তুলল। অনিরুদ্ধ চুরুট দিলেন। যেমন প্রতিদিনই দেন।

সবিনয়ে জয়ন্ত প্রত্যাখ্যান করল সেটি।

'কি হল? শরীর খারাপ?' জয়ন্তকে জিজ্ঞাসা করল ইলোরা।

'না।'

'তবে?' অনিরুদ্ধ বললেন।

'অনেক হল—এবার ফিরে চলুন। আপনার নয়াগৌড় আর যেখানেই থাক এ পৃথিবীতে নেই।'

'নয়াগৌড়। বা নবগৌড়। বাঃ। অবিশ্বাসের সঙ্গে হলেও ভালো নামটাই দিয়েছ।'

'কিন্তু কি ভাবে তুমি বলছ নেই নবগৌড়? আছে—নিশ্চয় আছে।' রতনের গলায় এতো প্রত্যয়!

'থাকলেও সেটা তোমার উর্বর মস্তিস্কেই আছে রতনদা'—এ

কমাসে রতনদা বলেই ডাকে জয়ন্ত ওকে—যদিও মনের গভীরে অবিশ্বাসের বীজটুকু রয়েই গেছে।

তর্ক জমে উঠল। অনিরুদ্ধ অবিচল তাঁর বিশ্বাসে—সেটা তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণায় লব্ধ। রতন কিসের ঝোঁকে তাঁকে সমর্থন করছে সেই জানে। ইলোরা বাবার সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে না। সুতরাং একদিকে জয়ন্ত একা—অন্যদিকে তিনজন।

এই সময়ে যেন বাজ পড়ল একটা। কফির ট্রে হাতে ঢুকল অজমাংলু। প্রতি সন্ধ্যেতে আসর বসে ওঁদের—আর অজমাংলুর প্রথম কাজই হচ্ছে আগুন জ্বাললে কফি করা এবং পরিবেশন করা সেটা সাহেবদের।

তা সেই অজমাংলুই ঢুকেছে কফি হাতে। তাতে বাজ পড়ার কি আছে!

বাজ পড়েছে অজমাংলুর কথায়। কফির কাপগুলো দিতে দিতে সে জিজ্ঞাসা করল—'সাহেবরা কি নয়াগৌড় খুঁজতে বেরিয়েছেন?'

কথা হচ্ছিল চারজনের বিশুদ্ধ বাংলায়। অজমাংলু বুঝল কি করে? বিশেষ করে ঐ নয়াগৌড় বা 'নবগৌড়' শব্দটি! হাতের কফি সবারই চলকে উঠল।

রতন হঠাৎ এতদিন বাদে পুলিশী স্বভাব ফিরে পেল। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল সে। অনিরুদ্ধ যোগ দিলেন। কেননা রতনের পক্ষে—অজমাংলুর দেশীয় ভাষায় বেশী কথা বলা সম্ভব হত না।

আছে—নয়াগৌড় আছে। আর কিমাশ্চর্যম্! জায়গাটার নাম নয়াগৌড়ই। যদিও অনিরুদ্ধ বুঝলেন ওটা নবগৌড়ই হবে।

কিন্তু অজমাংলু জানল কি করে?

'সে জানবে না? তার মা ছিল ঐ নয়াগৌড়ের মেয়ে! ওখানকার মেয়েরাও বনে শিকার করে মাঝে মাঝে। কি ভাবে দল ছিটকে এসে পড়ে অনেক দূরে—পথ হারিয়ে ফেলেছিল বোধহয়। আর তার বাবা মাংলু সর্দার তাদের জাতে ছিল দুর্ধর্ষ শিকারী। যে অরণ্যে কোন

মানুষ কোনদিন যায়নি সেখানেই সে যেত। এইভাবেই কোন এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে গভীর অরণ্যে দেখা হয়ে যায় পথহারা ঐ তরুণীর সঙ্গে মাংলু সর্দারের। নিজের দেশের পথ সে চিনতে পারেনি—তাই মাংলুর সঙ্গেই সে চলে আসে। বিয়ে করে দু'জনে। সাহেবরা যে ভাষায় কথা কইছেন—ওর দু'টো একটা শব্দ ও মায়ের কাছে শুনেছে। মা তাকে অনেক কথাই শেখাতে চেয়েছিল—কিন্তু অনেক ছোট বয়সেই যে সে মারা গেল।'

মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন সব। আছে! তাহলে সত্যিই আছে ললিতাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য! আছে যে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঐ তো অজমাংলু।

'হ্যাঁ সাহেব। বাবা নাম দিয়েছিল মাংলু। মা ডাকত "অজ" বলে।' অনিরুদ্ধ বুঝলেন ওটা অজয়। মাংলুর উচ্চারণে ওটা অজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'তা তোমার মায়ের নাম কি ছিল? নিঃসংশয় হতে চান অনিরুদ্ধ।

'আলকা'।

'আচ্ছা।' ওটা যে অলকা সেটা সবাই বুঝল।

জয়ন্ত যে জয়ন্ত, তার অবিশ্বাসী মনটাকেও দোলা দিয়ে গেল 'অলকা' নামটা।

'তা তোমার মা কোনদিন বলেননি কোন পথ দিয়ে গেলে তাঁর দেশে পৌছান যায়?'

অনেক মাথা চুলকোল অজমাংলু। তারপর হঠাৎ উল্লাসে চিৎকার করে উঠে বলল—'আরো যেতে হবে সাহেব। তবে পাওয়া যাবে হাতির রাজ্য। একদিকে হাতি—অন্য দিকে ঐ যে সেই গরিলা। সেই পেরিয়ে তবে।' বলে কি? হাতির রাজ্য—দুঃসাধ্য। গরিলা আছে এখনও! সে তো আরো ভয়ানক।

'একটা নদীও আছে—তার নাম স্নুধনী।'

অন্য কারোর মাথায় না এলেও অনিরুদ্ধের মাথায় এল আধুনিক ভৌগোলিক মানচিত্রে এপাশে কোন নদী তো চিহ্নিত নেই। তার মানে সুধনী নামটা ওর মায়ের কাছেই ও শুনেছে। সুতরাং ওটি সুরধনী। গঙ্গা।

অতএব। অতএব জয়ন্তের হতাশা কাটতে বাধ্য। রতন শুধু লাফাতে বাকী রাখল। ইলোরার গলায় এই প্রথম সবাই গান শুনল —'ও আমার দেশের মাটি!'

জয়ন্ত মনে মনে প্রশংসাই করল ওর সুরেলা গলার।

*　　*　　*

পরের দিন। জয়ন্তের ঘুম ভাঙল। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ও প্রথম অবাক। —এত বেলা! কিন্তু তাঁবুর ফাঁক দিয়ে যে আলো এসে পড়ছে সেতো অনেক বেলার আলোই। ঘড়িও তো তাই বলছে। উঠতে গিয়ে সারা শরীরে একটা অবশ ভাব। সেই অবস্থাতেই পাশের বিছানায় অনিরুদ্ধের দিকে তাকিয়ে দেখল সে। এ কি! তিনি এখনও ঘুমোচ্ছেন! তারপরই নজর পড়ল মাথার কাছে! এ্যাটাচি কেসটার দিকে।......নেই!

কোথায় গেল! লাফ দিয়ে উঠল জয়ন্ত। সমস্ত জিনিস তছনছ করা। কোথায় গেল অবশ ভাব। ছুটে বেরোল জয়ন্ত। ইলোরাও ঘুমে আচ্ছন্ন। কানু—বাসু—সবাই। মায় মানিক জোড়ের লম্বুটা। খালি জেগে বসে রয়েছে খর্বকায় মানুষটি। অজমাংলুর দেখা নেই। দেখা নেই পাকড়াশির। নেই একটি গাধা—আর নেই গোটা চারেক বন্দুক আর বেশ কিছু গোলাগুলি।

জয়ন্ত ডাকাডাকি করে তুলল সবাইকে। বোঝা গেল রতন পালিয়েছে—সঙ্গে অজমাংলু। নিয়ে গেছে আসল প্রমাণ—গৌড়ভুজঙ্গ কণ্ঠহার। এবং তুলোট চিঠি। সঙ্গে সেই লালকোট। ওষুধপত্রও।

বোঝা গেল ঘুমের ওষুধ খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে রতন পালিয়েছে—

সঙ্গে নিয়ে গেছে অজমাংলুকে। সহজ সরল মানুষটাকে কি বুঝিয়েছে কে জানে ?

কিন্তু সবাই বেহুঁস হল বান্থুটি নয় কেন ?

বান্থুটি বলল, তার গত রাতে শরীরটা খারাপ লাগছিল তাই সে হু'টো ফল খেয়ে আগেই শুয়ে পড়ে, রান্না খাবার সে খায়নি। রোয়াণ্ডাও সমর্থন করল সে কথা।

অনেক অনেক দেরি হয়ে গেল। যদিও আসল বস্তুটি নেই। অমূল্য কণ্ঠহার। গৌড়ভুজঙ্গের অর্ধ মণিহার এখন আদিত্য জয়ন্তের বদলে পাকড়াশি রতনের হাতে। জয়ন্তের সম্বল জ্যাঠার চিঠি আর ছবিটা মাত্র। ও হু'টোর খবর জানা ছিল না রতনের। জানলেও ও দিয়ে তার কি প্রয়োজন ? আসলটাই তো তার সঙ্গে।

রওনা হতে হতে অনেক বেলা। অনিরুদ্ধ পরামর্শ দিলেন দেরিই যখন হয়েছে তখন একেবারে দিনের খাওয়া সেরে বেরনোই ভালো।

মন ভেঙে গেছে জয়ন্তের। ক্ষণেকের জন্য যদি বা গতরাতে উজ্জীবিত হয়েছিল আবার অবসাদে তা বিষণ্ণ।

* * *

পেয়েছে খুঁজে, পেয়েছে একটা নদী। বাবাঃ সেই রাত একটায় রওনা দিয়েছে রতন। একটা গাধার পিঠে মালপত্র চাপিয়ে অজমাংলুর সঙ্গে অমূল্য কণ্ঠহার নিয়ে চলেছে সে রাত থেকে। অজমাংলুকে সে বুঝিয়েছে ওই নয়া গৌড়ের রাজার বংশধর ও। প্রমাণ স্বরূপ চুরি করে এনে দেখিয়েছে সেই কণ্ঠহার।

ভক্তি শ্রদ্ধায় পায়ের উপর লুটিয়ে পড়েছে অজমাংলু। মায়ের মুখে সে শুনেছে ঐ গলার হার তার মায়ের দেশের মন্দিরে পুজো হয়। কোন দেবতা নাকি স্বর্গ থেকে নেমে এসে ঐ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চলে যাওয়ার সময় রেখে গেছেন অর্ধহার। বলে গেছেন আবার আসবেন তিনি বা তাঁর বংশের কেউ বাকী অর্ধহার নিয়ে। তাহলে রতনই সেই দেবতার বংশধর !

রতন সুনিপুণভাবে বুঝিয়েছিল—বাকীরা সবাই ওরই সঙ্গী।

মাংলু ক্ষীণকণ্ঠে একটা প্রশ্ন করেছিল 'তাহলে দেবতা পালাচ্ছেন কেন?'

'পালাব না বলিস কি? ওরা যে আমাকে খুন করে এই রত্নহার নিয়ে নয়া গৌড়ে যাওয়ার ধান্দায় আছে।'

মাংলু আর প্রশ্ন করল না—দেবতাই যদি হবেন তবে কেন তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন না?

তা সেই রাত একটায় কাউকে সাক্ষী না রেখে পালাল রতন—সঙ্গী অজমাংলু। দেবতা ভরসা দিয়েছেন রাজ্যে গিয়ে তাকে বেশ খানিকটা জমিদারি দিয়ে একটা বড় সর্দার বানিয়ে দেবেন।

সারল্যই কাল হল অজমাংলুর। প্রতারণাকে বিশ্বাস করল।

এখন বেলা বারটা। প্রায় এগার ঘণ্টার পথ পিছনে ফেলে এসেছে রতন জয়ন্তদের। এমন সময় পাওয়া গেল একটা নদীর স্রোত।

বাঃ এইখানেই দুপুরের খাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক। জলের দিকে তাকিয়ে রতনের মাথা ঘুরে গেল। না—ভয়ে নয়—রসনার লালা বোধ করি তার মাথায় উঠে বসেছে। এত বড় বড় মাছ! রুই—না—কাতলা! জয় তারা। রতন জলে হাত বাড়িয়ে দিল। মানুষ দেখেনি মাছগুলো। কোলের শিশু যেমন সহজেই মায়ের হাতে ধরা দেয় তেমনি ধরা দিল রতনের হাতে বিশাল এক পাকা রোহিত জাতীয় মৎস্য। আহা! জীব দিলেন যিনি আহার যোগান তিনি! একেই বাঙালী—তায় মাছ!

গাধাটাকে একটা পাথরের সঙ্গে বাঁধা হল বাঁধন দিয়ে। বঁটি নিয়ে নিজেই বসে গেল রতন মাছ কুটতে। অজমাংলুর হাতে দিয়ে এমন মাছের সব্বোনাশ ও ঘটাতে পারবে না। বঁটিটাতে মাছটাকে দ্বিখণ্ডিত করেছে কি করে নি! নিঃশব্দে উল্কাপাত হল যেন।

কি বলে একে! ধূসর রঙ। বিশাল পাহাড় একটা! ভাগ্যিস গাধাটাই নজর ছিল পশুরাজের। পড়ল তার ঘাড়ে।

রতনও একমুহূর্তে বঁটি ফেলে রাইফেল হাতে তুলে নিল—চোখ বুজে ছুঁড়ল গুলি! আহত পশুরাজ একটা লাফ দিল নদীর ওপারে। গাধাটাও ছটফট করতে করতে গিয়ে জলে পড়ল।

মাংলুর হাতে রাইফেল ধরিয়ে দিয়ে কপালের ঘাম মুছে রতন মাছ কোটায় মন দিল। মাছটা ফেলে চলে যাওয়া যায় কি? এ মাছ আর কবে ভাগ্যে জুটবে কে জানে।

তা হল। রান্না হল। যতরকম পদ জানা ছিল রতনের—সবই। ঝোল—ঝাল—ভাজা—অম্বল। মাংলুও খেল। অন্যদিনের তুলনায় বেশীই। এরকম সুস্বাদু খাবার যে এই মাছে হয় দেবতা নইলে আর কে জানবে! কিন্তু মাংলুর আবারও একটু খটকা লাগল—দেবতা গাধাটাকে বাঁচালেন না কেন? এখন ঐ মাল তো তাকেই বইতে হবে!

খাওয়া দাওয়ার পর আবার রতন রওনা দিল। কিন্তু ফেলে রেখে যেতে হল অনেক জিনিস—মায় ওষুধের বাক্সটাও।

* * *

রতন রওনা দিয়েছে রাত একটায় সাক্ষী না রেখে। রতন জানে জয়ন্তদের টের পেতে পেতে বেলা গড়িয়ে যাবে। যে কড়া ঘুমের ওষুধ সব কটাকে খাওয়ানো হয়েছে। কেবল বাঁটকুটা অসুস্থ ও কিছুই খেল না। বেশী জোর করতে ভরসা পায়নি মাংলু। কি জানি কিছু যদি ভাবে।

ভেবেছিল না—দেখেছিল বাম্বুটি। গোপন পরামর্শ করতে মাংলু আর রতনকে।

বাম্বুটি। বাম্বুটি তাই ফল খেল। গাছ থেকে পাড়া ফল। বাম্বুটি জানে রাতে কিছু ঘটবে।

একটায় রওনা দিল রতন। দেড়টায় নিঃশব্দে বেড়ালের মতো বাম্বুটি এসে শিশ দিল যেমন দিয়েছিল জারবি। একই পদ্ধতিতে এসে উঠল একটা গাছের চৌডালায়। নেমে এল কিছুক্ষণ বাদে।

বাম্বুটির রাতের গোপন অভিসার বাম্বুটি ছাড়া কেউ জানে না।

*　　　　*　　　　*

রতনের ভরসা মাংলু। অনিরুদ্ধের ভরসা ভূগোল, ইতিহাস জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা।

অজমাংলু নেই। দলের নেতা হবে কে? আর কে আটফুটি রোয়াণ্ডা ছাড়া!

বেলায় বেরিয়েও অনিরুদ্ধ ক্রমাগত ডানদিক ঘেঁষে কোনাকুনি এগোতে লাগলেন।

ফলে এগার ঘণ্টা পরে রওনা দিয়েও সন্ধ্যে নাগাদ এসে পৌঁছোলেন তাঁরা রতনের পরিত্যক্ত জায়গায়। ছাই—মাছের আঁশ —প্রমাণ দিল রতন এখানেই দ্বিপ্রাহরিক আহার সেরেছে। কিন্তু জলের মধ্যে মৃত গাধা কেন?

গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন অনিরুদ্ধ। ডাকলেন বাম্বুটিকে। পিগমিরা এসব ব্যাপারে অনেক অভিজ্ঞ। রোয়াণ্ডা—বাম্বুটি দু'জনেই বলল—মনে হচ্ছে সিংহ আছে কাছে পিঠে।

কিন্তু কানু বাস্থু! মাছের আঁশ দেখেছে—দেখেছে জলের মধ্যে মাছ। আর পায় কে? আট-আটটা মাছ ধরে ফেলল নিমেষে। সন্ধ্যে বেলায় মাছের ভোজ বসে গেল। ভোজ শেষ হয়েছে সবে— চারপাশে মেঘের গর্জন!

সিংহ—সিংহ। বলে ছুটে বেরোলেন অনিরুদ্ধ। একটা গুলির আওয়াজ। জয়ন্তও বেরিয়েছে। বেরিয়ে এসেছে ইলোরাও। রাইফেলে গুলির বর্ষণ। কিন্তু এত সিংহ কোথা থেকে এল?

এপাশে ওপাশে অন্তত গোটা বিশেক। তিনজনের গুলিতে তিনটে আহত হচ্ছে তো ছ'টা এগিয়ে আসছে। বিশাল একটা সিংহ; গুলি খেয়েই বোধহয় লাফ দিল সেটা। জয়ন্ত—জয়ন্তের মাথাটা তার লক্ষ্য।

জয়ন্ত পিছনে মারল লাফ। কিন্তু দুর্ভাগ্য। পিছনে একটা

পাথরে ঠোক্কর খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল—তার ঘাড়ে এসে পড়ল আহত পশুরাজ।

কিন্তু পশুরাজের দু পাঁজরায় ততক্ষণে দু'খানা বল্লম আমূল গেঁথে গেছে। কানু-বাসু ছুটে এসেছে বল্লম হাতে। তাদেরই বল্লম দু'টো। এলিয়ে পড়ল পশুরাজ।

অজ্ঞান হল জয়ন্ত। বাম্বুটির তীর। বাকীদের বল্লম। অনিরুদ্ধ ইলোরার গুলি। সিংহ বাহিনীর এগার জন ভূমিশয্যা নিল। বাকীরা আপাতত অপসৃত। সারারাত পাহারা চলল—জ্বলল আগুনের শিখা লকলক করে; কিন্তু ক্রুদ্ধ সিংহরাজরা ক্রুদ্ধতর হয়ে ঘোরাফেরা করতেই থাকল।

তিন তিনটে দিন। জয়ন্ত বিছানা ছেড়ে উঠতে পারল না।

তিনদিন ধরে মাছের রান্না, সিংহের হুঙ্কার এবং জয়ন্তের সেবা—এই চলল। ভাগ্যি রতন ওষুধের বাক্স ফেলে গিয়েছিল তাই জয়ন্তের চিকিৎসাটা হল। জয়ন্ত কেবল হাহুতাশ করে। একে প্রমাণ হাতছাড়া তায় রতনের থেকে চারদিন পিছনে।

চারদিনের দিন জয়ন্ত সুস্থ হল। ধীরে ধীরে রওনা হওয়া ভালো।

কিন্তু এ আবার কি? রোয়াণ্ডা এসে মাথা নীচু করে বলল এতদিন সাহেব অসুস্থ হয়েছিলেন তাই তারা কিছু বলে নি—কিন্তু এর পরও যদি সাহেবরা এগোতে চান তারা অক্ষম—তাঁদের সঙ্গ দিতে। অনেক বোঝালেন অনিরুদ্ধ। না। তারা আর যাবে না। সাহেব দয়া করে তাদের পাওনা গণ্ডা আর এক একটা বল্লম যদি দেন আত্মরক্ষার জন্য—তাহলেই তারা চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

কিন্তু কারণটা কি? সিংহ—না হাতি—না গরিলা।

না—কারণ ওর কোনটাই নয়।

তবে, শয়তানের নিশির ডাক শুনেছে তারা।

শয়তানের নিশির ডাক!

হ্যাঁ শয়তানের নিশির ডাক। এর মানে আর এগিও না!

ঘুমের ঘোরে একটা শাঁখের আওয়াজের মতো শুনেছেন অনিরুদ্ধ —ক্ষীণ! সেটাই কি? 'সেটাই'—সমস্বরে ওরা বলল।

কি আর করা! সবাইকেই বিদায় দিতে হল। কিন্তু বাম্বুটিকে যখন পাওনা মেটাতে গেলেন অনিরুদ্ধ, সে একগাল হেসে বলল—সে তো বলেনি যে সে ফিরে যাবে!

সে কি? মানিক জোড়ের একজন যাবে—একজন থাকবে?

তা আর কি করা যাবে। বাম্বুটি কথা দিয়েছিল সাহেবদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত থাকবে। কথা ভাঙা তার কাজ নয়।

অতএব বাম্বুটি থাকল, বাকীরা সবাই বিদায় নিল।

পনের

তিন তিনটে দিন আটকে পড়ল জয়ন্তরা সদলে।

কিন্তু রতন পাকড়াশি এই তিন দিনে এগিয়ে চলেছে অজমাংলুর সাহায্যে। জঙ্গল ঘন—আরও ঘন। তিনদিন পথ চলার পর ওদিকে তখন অনিরুদ্ধ অন্যদের বিদায় দিয়ে আবার সেই ছ'জনের দল নিয়ে এগোলেন—তাঁরা তিনজন, কান্থ-বাম্থ—না-ওরা দু'জন সঙ্গ ছাড়েনি, আর বাম্বুটি। সঙ্গে দু'টো গাধা।

একটা নিয়ে গিয়েছে রতন; তার এখন সলিল সমাধি ঘটেছে। একটা তিনি দিয়ে দিয়েছেন রোয়াণ্ডাদের—প্রত্যাবর্তনের পথে ওদেরও খাবার-দাবার কিছু দিতেই হয়েছে। অনিরুদ্ধ অমানুষ নন—গ্রাম্য সহজ সরল মানুষ এরা, কুসংস্কার এখনও সারা মনে—শয়তানের নিশির ডাক শুনে ওরা যদি ভয়ই পায় কিছু বলার নেই—সুতরাং। এখন ছ'জন মানুষ আর দু'টো গাধা। মালপত্রের বোঝা সকলের সঙ্গেই অনেক। দুটো গাধাতে আর কত টানবে—তার উপর জয়ন্তের শরীর এখনও খুবই দুর্বল।

অনিরুদ্ধরা যখন রওনা দিলেন অন্য দিকে তখন রতন পৌঁছে

গেছে অনেক দূরে। সে কথাই বলছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে ওরা দু'জন যেখানে পৌঁছেছে জায়গাটা দেখেই মাংলু প্রায় আঁতকে উঠল।

'কি হল?' জিজ্ঞাসা করল রতন।

'সাহেব। হাতি।'

'হাতি? কি করে বুঝলে হাতি?'

'এই দেখুন না—দেখছেন না ছোট ছোট গাছপালা কি রকম মাটির সঙ্গে মিশে গেছে—হাতিরা যখন দল বেঁধে এক জায়গা দিয়ে যায়, তখন চারপাশ তছনছ করতে করতে যায়—এ জায়গা দিয়ে হাতিরাই গেছে।'

তার মানে হাতির রাজ্য নাকি; মাংলু যে পথের বিবরণ দিয়েছিল তার মায়ের কাছ থেকে শৈশবের বর্ণনা অনুযায়ী—তাতে এ জায়গা পেরোতে দশদিন লাগবে।

লাগুক। এদিকে হাতি ওদিকে নাকি গরিলা। যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন। 'চল এগো—দাঁড়ালি কেন?' রতন তাড়া দেয়। কথাটা তার মুখ দিয়ে খসেছে কি খসেনি একটা অদ্ভুত আওয়াজ শোনা গেল। একটা নয় অনেকগুলো।

'হাতি—হাতির ডাক!' ভয়ে মাংলুর গলা দিয়ে যেন শব্দই বেরোতে চাইছে না।

রতনেরও মনে পড়ল কলকাতার চিড়িয়াখানার এ ডাক শুনেছে সে। কিন্তু এতো ভয়ের কি আছে? হাতে তো তার রাইফেল।

কিন্তু ভয় রতনও পেল- চল্লিশ গজ দূরেও নেই—দেখা যাচ্ছে বিশাল বিশাল হস্তিপুঙ্গবদের। গজদন্তগুলো লম্বায় বোধহয় কোনটাই আড়াই ফুটের ওদিকে নয়।

'সাহেব পালান একবার হাওয়ায় যদি ওরা আমাদের গন্ধ পায়!' বলতে বলতেই মাংলু সামনের বিশাল মহীরূহ লক্ষ্য করে দৌড় লাগাল।

দুর্ভাগ্য মাংলুর। ঠিক সেই সময়েই হাওয়াটা যেন ঘুরে গেল। মাংলু ছুটল মালপত্র ফেলে। হাতির পাল গন্ধ পেয়েছে। এই বুনো হাতির দল, এরা বোধহয় জন্ম জন্ম ধরে মানুষকে তাদের চিরশত্রু বলে মনে করে—আর সেই মানুষ কিনা তাদের রাজ্যে—এই দু'-পেয়েটাকে শেষই করে ফেলব—এই রকম একটা যুদ্ধং দেহি ভাব নিয়ে ছুটল হাতির পাল। মাংলু একবার দেখছে রতন কি করে। শেষ করুণ ডাকটা দিল ও রতনকে, 'সাহেব এখানে চলে আসুন।'

রতন। রতন পাকড়াশি। ধুরন্ধর পুলিশ অফিসার। সে বুঝল হাওয়া বইছে মাংলুর দিক থেকে হাতির পালের দিকে। হাতিদের চোখও এখন ঐ মাংলুর উপর। সুতরাং হাওয়ার বিপরীতে গেলে রতনকে হাতিরা দেখতে পাবে না। অতএব রতন ছুটল অন্যদিকে। সঙ্গে এ্যাটাচিকেসটা দড়ি দিয়ে গলায় ঝুলিয়ে রাইফেলটা সঙ্গে নিয়ে পড়ি কি মরি করে সে ছুটল উল্টো দিকে। অবশ্যই তারও নজর আরেকটা গাছ।

মাংলু দেখল— দেখল তার দেবতা তাকে অস্ত্রহীন অসহায় অবস্থায় রেখে চলে গেলেন। সাহেবের হাতে রাইফেল—সঙ্গে ঐ বাক্সটা আর জলের বোতল ও শুকনো খাবার ভরা একটা ছোট্ট থলে। এই তার দেবতা!

কিন্তু অত ভাববার সময় ওর নেই। যে গাছটা তার লক্ষ্য ছিল তার দিকেই সে ছুটল। তরতর করে একেবারে চৌডালায়। নিজেকে বেঁধে ফেলল গায়ের চাদরটা দিয়ে গাছের সঙ্গে। কারণ হাতির স্বভাব ও জানে—মানুষটাকে পায়নি—কিন্তু দরকারে ঐ ধারালো দাঁতের সাহায্যে মাটি আলগা করে শিকড়শুদ্ধ গাছ উপড়ে আনতে পারে ঐ গোদা হাতির পাল।

করলও তাই। নেহাত আসার সময় বাপের দেওয়া ছোট্ট তীর ধনুকটা তার সঙ্গে ছিল। প্রয়োজন লাগবে তা ভাবেনি। সাহেবদের সঙ্গে থাকবে সে, অত গোলা বারুদের পরেও তীরধনুক লাগবে কিসে?

ভেবেছিল একবার। তারপর আবার কি ভেবে সেটা সঙ্গেই এনেছে—বলা তো যায় না—বনবাদাড়ের ব্যাপার—বাপের স্মৃতিটুকু সঙ্গে থাক।

হাতির পাল এসেছে। মাংলু যা ভেবেছে! একবার শুঁড় তুলে গন্ধ শুঁকে নিচ্ছে—তারপরই লেগে যাচ্ছে দাঁত দিয়ে মাটি খুঁড়তে।

থরথর করে কেঁপে উঠছে বিরাট গাছটা। অনেক ভেবে--সামনের গোদা হাতিটার চোখ লক্ষ্য করে পাঁচটা তীরের একটা ছুঁড়ল মাংলু। না লক্ষ্য তার বেঠিক হয়নি। একেবারে সিধে বাঁচোখ ভেদ করে তীরটা ঢুকে গেছে গোদাটার শরীরে। একটা ভয়ার্ত চিৎকার করে সে পিছু হটল।

ব্যাপারটা কি বোঝার আগেই, পিছনের দিকের একটা হাতিকে লক্ষ্য করল মাংলু। আরেকটা তীর। বুদ্ধি যে একেবারে নেই মাংলুর তাতো নয়। সামনের হাতিটার আর্ত চিৎকার সঙ্গে সঙ্গেই পিছন থেকে আরেকটা আর্তস্বর। হাতির পাল ভাবল সামনে পিছন দু'দিক থেকে আক্রমণ হচ্ছে বুঝি বা। পিছু হটল। রইল পড়ে দু'টো হাতি।

কিন্তু হাতিরাও অত বোকা নয়। যদিচ তারা জানেনা মাংলুর ভাঁড়ারে মাত্র আর তিনটে তীর। তবুও গাছের উপরে বসা ঐ দু'পেয়েটার হাতে শুধু শুধু মরি কেন এরকম ভাব নিয়ে ওরা দূরে সরে গেল।

সরেই গেল। পালাল না। আজ হোক কাল হোক ওই দু'-পেয়েটাকে গাছ থেকে নামতেই হবে। চিরকালটা তো আর ও গাছের ডালে থাকতে পারবে না। তা নিরাপদ দূরত্ব থেকে দু'টি করে হাতি পাহারায় রেখে হাতির পাল চলে যায় আহার সংগ্রহে। পালা দিয়ে চালিয়ে যায় পাহারা।

রতন আন্দাজে আর চোখের দৃষ্টি যতদূর যায় তাই নিয়ে ব্যাপারটা বুঝল। কিন্তু নামার প্রশ্নই নেই। তাহলে হাতির পাল মাংলুকে ছেড়ে ওর পিছনেই ছুটবে।

আটকা রইল দু'জন দু'গাছে।

জানতেও পারল না—তাদের মাথার উপর দিয়ে ছুটে চলে গেছে কখন একটা বাঁদর।

* * *

অনিরুদ্ধরা হাঁটছেন! অনিরুদ্ধ যেখানে সিংহ পেয়েছিলেন সেই নদীর ধার দিয়ে এগিয়ে চলেছেন। এ কোন নদী? চওড়ায় যতই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে স্রোত হচ্ছে ততই তীব্র।

রাত হলেই তাঁবু পড়ছে। সিংহের ডাক এখনও পিছু ছাড়েনি—তার মানে সিংহের রাজত্ব শেষ হয়নি। একরাতে তার সঙ্গে কানে এল ক্রুদ্ধ হাতির ডাক। একদিকে সিংহ—অন্য দিকে হাতি। বুনো হাতি আর বুনো সিংহ কার থেকে কে বেশী হিংস্র!

কিন্তু তারই সঙ্গে রাতে শোনা যায় সেই শয়তানের নিশির ডাক। এটা যে কিসের ডাক—কিছুতেই বুঝতে পারলেন না অনিরুদ্ধ।

তিনদিন কেটে গেল তাঁদেরও। পথ অনেকখানি তাঁরাও এসেছেন। কিন্তু সিংহের গর্জন শুনেছেন—হাতির ক্রুদ্ধ বৃংহিত শুনেছেন—নিশির ডাকের তীব্র ধ্বনি শুনেছেন—আক্রান্ত হননি এখনও।

তিনদিন বাদে চারদিনের দিন সন্ধ্যের আগেই বিকেল বিকেল এসে পৌঁছোলেন নদীর কিনার ধরে এমন একটা জায়গায় যেখানটায় নদীর তীর ঘেঁষে জঙ্গল খানিকটা ফাঁকা। বেশ ছোট্ট মতো চত্বর বলা যায়। বিকেলেই তাঁবু ফেললেন অনিরুদ্ধ। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে উত্তরমুখো দূরবীন ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। এ নদীর উৎসমুখ কোথায়? কিন্তু দূরবীনে আবছা সাদা ওটা কি দেখা যায়? অন্ধকার হয়ে আসছে। ভালো বোঝা যাচ্ছে না—তবু অনিরুদ্ধের মনে হল পাহাড়ই বুঝি। কিন্তু এখান থেকে রুয়েনজারি পর্বতমালা তো অনেক পুবে। তবে প্রকৃতির খেয়াল। হয়তো বা তারই কোন শাখা মাটির তলা দিয়ে এসে এখানে আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

তাহলে ? তাহলে কি ঐ পর্বত থেকেই নেমে আসছে এই ছোট্ট জলধারা !

আর ওপারে ওই পর্বতের আড়ালেই কি তাঁদের স্বপ্নের সেই রাজ্য ?

অনিরুদ্ধ বললেন জয়ন্ত আর ইলোরাকে সব কথা ! সারারাত তিনজনের কারোরই ভালো করে ঘুম হল না। সেই আধো ঘুমে সিংহের ক্রুদ্ধ গর্জন—হাতির ক্ষিপ্ত আওয়াজ আর ঘন ঘন শয়তানের নিশির ডাক। পাগল হয়ে যাবার অবস্থা !

কিন্তু তাঁরা কেউ জানেন না রাতের অন্ধকারে এবার একটা নয়—একাধিক বাঁদর ছুটে চলেছে গাছে গাছে।

সকাল হল। না হলেই বুঝি বা ছিল ভালো।

সকালের প্রাতরাশ আর সারা হল না।

বান্বুটি খবর দিল পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক।

দ্রুত বেরিয়ে এলেন অনিরুদ্ধ—জয়ন্ত এবং ইলোরা। না ভুল করেননি। রাইফেল আর টোটা সঙ্গে নিয়েই বেরিয়েছেন। কিন্তু কাকে গুলি ছুঁড়বেন—কাকে ? তাঁবুর পিছন দিকে একশ' গজ দূর দিয়ে সারি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পশুরাজের দল। গুনে শেষ করা যায় না। কয়েকশ' হবে। গোটা পাঁচেক অর্ধ চন্দ্রাকার সারি। সামনের দিকে ? যতগুলো হস্তিরাজ—তাদের গজদন্তগুলো দিয়ে কুতবমিনার গড়া যায় !

কিন্তু এরা দু'পাশে এভাবে দাঁড়িয়ে কেন ?

দু'পক্ষ দু'পক্ষকে আক্রমণ করতে প্রস্তুত। এটা তাদের জল খাওয়ার জায়গা। রাত্রের এক এক প্রহরে এক একদল পশু এসে জল খেয়ে যায়। কিন্তু গতরাতের এই আগন্তুক দু'পেয়েরা তাঁবু ফেলে আর আগুন জেলে জল খাওয়াটাই বন্ধ করে দিয়েছে। তার ফলে দু'পক্ষই সামনাসামনি।

লড়াই করবে নাকি হাতি আর সিংহ ? প্রথম একঝলক ক্যামে-রাটা ঘুরিয়ে নিল ইলোরা—দু'দিকেই।

'করছ কি ? এখন ছবি তোলার সময়—!' জয়ন্ত রাইফেল তাগ করতে করতে বলল।

'মরার আগে শেষ ছবিটা তুলে নিই।' ক্যামেরা বন্ধ করে ইলোরাও রাইফেল তুলে নিল।

এঁরাও দু' সারি।

একদিকে অনিরুদ্ধ-কানু-বাসু। অন্যদিকে জয়ন্ত-ইলোরা-বান্টুটি। বেচারী এতোই খর্বকায় রাইফেল তোলাই তার পক্ষে অসম্ভব। তাই তার হাতে পিগমি উপজাতির তীর ধনুক।

হঠাৎই শুরু হল দুপক্ষের ডাক। যুদ্ধং দেহি। পায়ে মাড়িয়ে যাও আগে এই দু'পেয়েদের। তারপর দেখা যাবে দাঁত আর থাবার জোর বেশী না গজদন্ত আর শুঁড়ের জোর বেশী!

গুলি চলল। ধারা বৃষ্টির মতো। তীরও ছুটছে। মরছে সিংহ— লুটিয়ে পড়ছে হাতি। কিন্তু কটা! কোন তাড়াহুড়ো নেই যেন এদের। একটা দু'টো সিংহ মরছে—একপা একপা করে তারা এগোচ্ছে। আহত হাতিরা সরে যাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে, ধীর পায়ে তার জায়গা নিচ্ছে অন্যদল।

না। গোলাগুলি শেষ হয়ে যাচ্ছে। বাকী গুলি রয়েছে তাঁবুতে। আনার সময় নেই। তবু তারই মধ্যে চোখে চোখে ইশারা খেলে গেল জয়ন্ত আর ইলোরার—ওদিকে অনিরুদ্ধ আর বাসুর। একদিক দিয়ে বাসু অন্য দিক থেকে ইলোরা তাঁবুর দিকে ছুটবে এমনি সময়ে—

মনে হল শতেক শয়তান নিশির ডাক ডেকে উঠল। স্তম্ভিত হয়ে দু'জনই দাঁড়িয়ে পড়ল। অন্যদিকে হাতি এবং সিংহের দলেও মনে হল একটা ক্ষীণ চাঞ্চল্য।

শয়তানের নিশির ডাক—এই ভোরবেলা কেন?

কেন? সে জবাব কে দেবে?

তীর কেন তার থেকেও দ্রুততম কোন কিছু থাকলে সেই বেগেই ছুটে এল সামনের দিক থেকে বিশটা ছিপের মতো সরু সরু নৌকো।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই নৌকো বিশটা অদ্ভুত উপায়ে সেই খরস্রোতা নদীর মধ্যে এপার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেকটা নৌকো থেকেই তীব্র তীক্ষ্ণ সুরে বেজে উঠছে নিশির ডাক। কাছ থেকে দেখে অনিরুদ্ধ বুঝলেন এক ধরনের শিঙা—ভেতরে বোধ হয় শঙ্খ আছে। ছ'টোর মিলিত আওয়াজ তাই এই রকম।

ঐতিহাসিক অনিরুদ্ধ—ব্যায়ামবীর জয়ন্ত বেপরোয়া ইলোরা নাবিক কানু-বাসু—স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে গেলেন।

শেষ শত্রু!

কিন্তু এরা কারা?

পিল্ পিল্ করে নামছে নৃশংস পিগমির দল। এরা পরিচিত বাম্বুটির মতো শহুরে নয়—চেহারাই মালুম দেয়। হাতে প্রত্যেকের তীর ধনুক। সংখ্যায় হাজার খানেক তো বটেই।

ছিপগুলোর গঠনও কেমন যেন। এ ধরনের ছিপ নৌকো কেউ দেখে নি। অনিরুদ্ধ ঐতিহাসিক। এই বিপদের মধ্যেও তাঁর স্মৃতি যেন তাঁকে প্রাচীন বাংলার এই ছিপের ছবি মনে করিয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু নৌকো থেকে নামল শুধু পিগমির দলই নয়। এক ধরনের কালো—লম্বায় কোনটাই ছ'ফুটের কম নয়—হাড়গিলে রোগা কুকুর না নেকড়ে কে জানে! সংখ্যায় শ'পাঁচেক তো হবেই।

মেয়ে বটে ইলোরা। রাইফেল ছেড়ে ক্যামেরা তার হাতে। ছবি তুলছে। তুলুক। কিন্তু পিগমিরা ঘিরে ফেলেছে অনিরুদ্ধদের। কুকুরগুলো সারি দিয়ে ব্যূহ রচনা করে একদল সিংহের মুখোমুখি, অপর দল হাতির। পিগমিদের ব্যূহ রচনাটাও অনেকটা সেই রকম।

এদের মনের ভাব বুঝতে দেরি হল না জয়ন্তের। হাতি বা সিংহদের হাতে এদের মরতে দেবেনা ওরা। কিন্তু বন্দী করবে নিজেরাই।

তাই হল। ওপাশে কুকুর-পিগমি বাহিনীর লড়াই চলছে একধারে সিংহ অন্য ধারে হাতিদের সঙ্গে। নৌকো থেকে ঐ তীব্র-তীক্ষ্ণস্বর

একটানা বেজে চলেছে। আর শ'খানেক পিগমিদের হাতে বন্দী হয়ে গেছেন অনিরুদ্ধরা ছ'জন।

বাধ্য হয়েই অনিরুদ্ধরা নৌকোগুলোর দিকে এগিয়ে চলেছেন। তারই মধ্যে লক্ষ্য করলেন হাতি এবং সিংহের দল পিছু হটছে। সম্ভবত এরাও ভয় পায় এই পিগমি ও সারমেয় যৌথ বাহিনীকে।

নৌকোয় তোলা হল ছ'জনকে। একই নৌকোতে।

এই নৌকোটা আকারে অন্যগুলোর থেকে বড়। মনে হল নৌকোটার প্রতি যত্নও নেওয়া হয় বেশী। হয়তো পিগমি সর্দার এতে করেই জলভ্রমণ করেন—নৌকোটার চেহারা দেখতে দেখতে জয়ন্তের ধারণাটা হল ঐ রকম। নৌকোটা ছাড়ল। আগে পাঁচখানা নৌকো। পিগমিরা কুকুরদের নিয়ে দ্রুত পদে পিছু হটে আসছে, যুদ্ধের অপূর্ব কায়দা! সিংহ বা হাতি—কেউই এগিয়ে আসছে না। এরা পিছু হটছে খুব সাবধানে। তারই মধ্যে অনিরুদ্ধ লক্ষ্য করলেন—তাঁদের তাঁবুগুলো থেকে শুরু করে সব জিনিসই নৌকো-গুলোয় ভাগাভাগি করে উঠে পড়ল। উঠে পড়ল কুকুর আর পিগমি বাহিনী। যদিও কয়েকটি কুকুর এবং কয়েকজন পিগমিও ধরাশয্যা গ্রহণ করেছে। ওদিকে মৃত হাতির পাহাড়—এদিকে মৃত সিংহ রাশি রাশি।

কুড়িটা নৌকোই ছাড়ল। আগে পাঁচটা। ছ'নম্বরে জয়ন্তরা। পিছনে চোদ্দটা।

তীর বেগে জল কেটে স্রোতের বিপরীতে নৌকোগুলো চলছে। সেই নিশির ডাক আর নেই। শব্দহীন! কেবল জল কাটার আওয়াজ।

অবশেষে!

অনিরুদ্ধ আগের বিকেলে যে পাহাড়কে আন্দাজ করেছিলেন—তারই কাছাকাছি এসে থেমে গেল নৌকোগুলো। কিভাবে যে ঐ খরস্রোতে নৌকোগুলো দাঁড় করাল নাবিকরা তারাই জানে।

এতক্ষণে লক্ষ্য করেছেন অনিরুদ্ধ নাবিকরা কিন্তু পিগমি নয়। চেহারায় যদি কোন সাদৃশ্য এদের থেকে থাকে সেটা আছে—কানু বা বাসুর সঙ্গে। সুদূর পূর্ববাংলার দক্ষ নাবিক-বংশধর কানাই—বাসুদেব।

তবে কি— ?

ভাবনার সময় দিল না। নৌবহর এমনভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে অনিরুদ্ধদের নৌকোটাকে মাঝে রেখে পাশাপাশি এদিকে ছু'টো ওদিকে ছু'টো—পাঁচখানা নৌবহরে একটা প্রশস্ত জেটির মতো। একপাশে পাহাড়ের কিনারা অন্য দিকে তীরভূমি—জঙ্গল। পিগমিদের হাতের তীর সেই জঙ্গলের দিকে উঁচিয়েই রয়েছে।

ভাবনার সময় দিল না অনিরুদ্ধকে। একটা আওয়াজ বোঁ-বোঁ। কানে তালা লেগে যায়। আকাশে তাকালেন তাঁরা। হ্যাঁ—একটি ব্যোমযান। আধুনিক
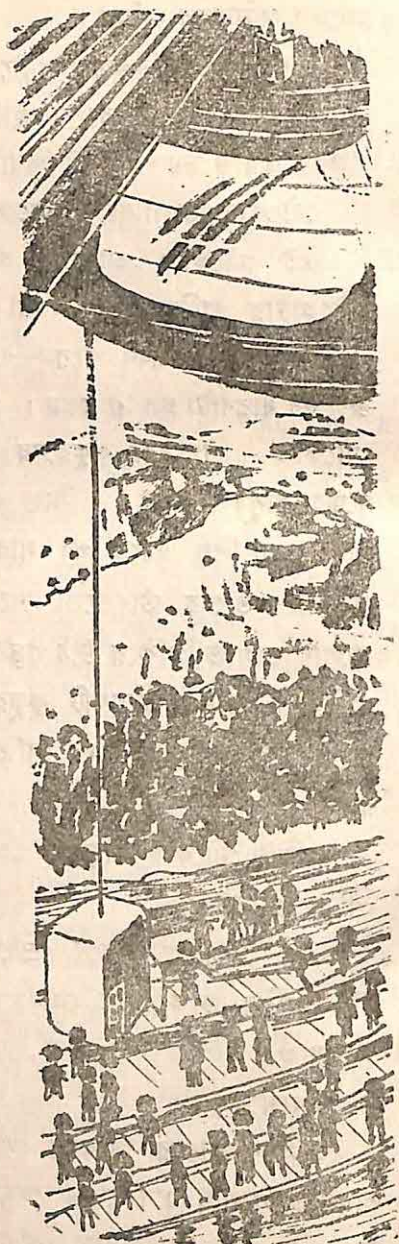
হেলিকপ্টার ধরনের কিন্তু তত ছোট নয়। যদিও উপর দিকে হেলিকপ্টারের পাখা ঘুরছে—কিন্তু বসার জায়গাটা বড়। দেখার মতো জিনিস। যিনি বানিয়েছেন তিনি আধুনিক বিমান কারিগরিতে যথেষ্ট উন্নতমানের কর্মী।

সেই ব্যোমযান যতটা স্থির হওয়া যায় স্থির হল ঠিক এই পাঁচখানা নৌবহরের মাথার উপর। উপর থেকে নেমে এল সেই অবস্থাতেই একটা আধুনিক লিফ্ট ধরনের বাক্স। ইঙ্গিতে তাতেই উঠতে বলল পিগমিদের দলপতি যার নেতৃত্বে এই নৌকোয় অনিরুদ্ধ-জয়ন্তরা বন্দী হয়েছেন।

কোন প্রতিবাদ না করেই তাতে উঠলেন—না—ছ'জন নয়। তিন জনের জায়গা হবে। সর্দার পিগমির নির্দেশে প্রথম উঠলেন তাতে অনিরুদ্ধ-জয়ন্ত-ইলোরা। বন্দুক রেখে যেতে হল। সঙ্গে রইল ইলোরার ক্যামেরা ব্যাগ। জয়ন্তের হাত তো খালি—জ্যাঠার ছবিটা অবশ্য নিতে আপত্তি করল না কেউ। আর অনিরুদ্ধের সঙ্গে তাঁর দূরবীন আর ছোট এ্যাটাচিকেস—যাতে তাঁর গবেষণালব্ধ প্রবন্ধরাজি।

কাঁপতে কাঁপতে লিফটের বাক্স সেঁদিয়ে গেল ব্যোমযানের ভিতর। ব্যবস্থা সুনিপুণ। তলার ঢাকনা বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। ব্যোমযান আকাশে উড়ল। আর সেই সময়েই তিনজনই চমকে উঠলেন একটি সম্ভাষণে।

চালকের আসনের পাশের থেকে উঠে এলেন এক শ্বেতশ্মশ্রুল বৃদ্ধ। বয়েস সত্তরের কাছাকাছি। সম্ভাষণটা তাঁরই মুখ থেকে বেরিয়েছে। 'সুস্বাগতম্ ডঃ অনিরুদ্ধ বোস, সুস্বাগতম্ মান্যবর জয়ন্ত আদিত্য, সুস্বাগতম্ মাতা ইলোরা।' বিশুদ্ধ বাংলা! নিজের পাশের আসনগুলোতে বসিয়ে দিলেন বৃদ্ধ এই তিনজনকে। দু'হাত দিয়ে অনিরুদ্ধের হাতদু'টো জড়িয়ে ধরলেন। জয়ন্তকে কিন্তু জানালেন সশ্রদ্ধ অভিবাদন। ইলোরার মাথায় হাত রেখে স্বস্তিবচন উচ্চারণ করলেন।

ব্যোমযান উড়ছে। পর্বত অতিক্রম করছে। তিনজন যাত্রী হৃতবাক। নিস্পন্দ।

বৃদ্ধ বললেন, 'আমি জানতাম ডঃ বোস আপনি একদিন জয়যাত্রায় সফল হবেনই।'

'কিন্তু আপনি কে? আমাদের চিনলেন কি করে?'

পর্বত অতিক্রম করে ব্যোমযান নেমে আসছে। জয়ন্তের চোখে পড়ছে এক সুশ্যামল রাজ্য। এরই বর্ণনা কি দিয়েছিল কল্পনা থেকে ইলোরা নবনগরে তাদের বাড়িতে বসে? ঐতো দেবালয়—ঐ তো জনপদ— ঐ তো কুল কুল করে বয়ে যাওয়া সুরধনী—ঐতো শ্যামল শস্যে ভরা বিস্তৃত ক্ষেত্র। কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে স্তোত্র।

ব্যোমযান যেখানে নামল—ছোট্ট একটা প্রান্তর। দূর দিয়ে সারিবদ্ধ পুরুষ ও নারী। স্তোত্রপাঠ করছে তারাই। পুরুষদের পরনে গৈরিক কাপড় ও উত্তীয়, নারীদের রক্তিম পাড় বসানো শুভ্র শাড়ি। গাত্রবর্ণ অনতিশ্বেত।

ব্যোমযান থেকে যখন এঁরা নামলেন—প্রবল ধ্বনি শোনা গেল একটা—'জয় গৌড়ভুজঙ্গ নরেন্দ্রাদিত্য—জয় রাজাধিরাজ ললিতাদিত্য জয়তু—জয়তু।'

সারিবদ্ধ নারী পুরুষের মধ্য দিয়ে পুষ্পাঞ্জলি মাথায় নিয়ে বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁরা যেখানে গিয়ে উঠলেন সেটাকে রাজ অতিথিশালা বলে অনায়াসেই বর্ণনা করা যায়।

আতিথেয়তার ত্রুটি তো নেইই বরঞ্চ রাজকীয়। কিন্তু অতিথিশালায় রাজপুরুষদের প্রহরাও আছে।

সামান্য জল পানের পর মুখ খুললেন বৃদ্ধ।

'তখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন না! আমি কে? আমায় চিনতে পারলেন না? আমি আপনার পূর্ব পরিচিত আরজুয়ান মালেক।'

'আপনি ? আপনি সেই আরজুয়ান মালেক ! কিন্তু আপনি এখানে ?'

'আমি তো এই নবগৌড়েরই মানুষ ডঃ বোস। আমি বর্তমানে এখানকার ব্যোমযান ও কারিগরি বিভাগের প্রধান। আমার নাম অর্জুন মল্লিক।'

'তার মানে আপনি—!'

'যা বলতে চাইছেন—সেটা আমিই শেষ করি। তার আগে দু' একটা কথা বলে নিই।'

সংক্ষেপে ইতিহাসটা বর্ণনা করলেন অর্জুন মল্লিক।

ললিতাদিত্য বহু পরিশ্রমে এ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর নির্দেশ ছিল কোনদিন যদি ভারতের বঙ্গভূমি থেকে গৌড়ভুজঙ্গের অর্ধ কণ্ঠহার নিয়ে তাঁদের বংশের অপর শাখার কোন উত্তর পুরুষ এখানে এসে উপস্থিত হন—তবে ললিতাদিত্যের বংশধর ও আগন্তুক আদিত্য বংশধরের মধ্যে এই নবগৌড়কে বিভক্ত করে দিতে হবে।

সেইভাবেই হাজার বছর ধরে রাজত্ব চলছে। ললিতাদিত্যের বংশধরেরাই এক এক করে সিংহাসনে বসেছেন ; কেউ আসেনি সুদূর বঙ্গভূমি থেকে হার আর তুলোটপত্র নিয়ে।

তাই বলে ভাবার কোন কারণ নেই যে রাজ্যটাকে খুঁজে বার করার বা অধিকার করার বাসনা নিয়ে কেউ প্রচেষ্টা করেনি। প্রতিবারই তারা প্রতিহত হয়েছে হয় বন্যজন্তু দ্বারা—নয়তো নবগৌড়ের শিক্ষিত নৌবাহিনী ও পিগমিসেনাদের দ্বারা।

প্রায় তিনশ' বছর ধরে নবগৌড়ের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে নানান ভাবে আধুনিক করে তোলা হয়েছে।

তাই তৈরি হয়েছে হস্তিবাহিনী, নৌবাহিনী, পদাতিক বাহিনী। আর আছে সারমেয় বাহিনী।

কয়েকশ' বছর আগে এ ধরনের সারমেয় পূর্ব বাংলায় দেখা যেত। পূর্ব পশ্চিম বাংলা তো দূরে থাক—সারা ভারত থেকেই এই অসম-

সাহসী সারমেয় জাতি লুপ্ত প্রায়, কিন্তু নবগৌড়ে এরা কয়েক সহস্র। এরা নবগৌড়ের প্রতিরক্ষা বাহিনীর দুর্দম অংশ একটা।

কিন্তু তাতেও শান্তি নেই। বিদেশীদের অনুসন্ধিৎসা লেগেই আছে। তাই বর্তমান আফ্রিকার প্রতিটি স্থানে গোপন অনুচর বাহিনী ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে যে কোন অভিযাত্রী দলের আগমন সন্দেহের উদ্রেক করলেই সে সংবাদ এসে পৌঁছে যায় নবগৌড়ে।

তাই নবগৌড় থেকেই একদিন বহু পরিশ্রম করে পাঠানো হয়েছিল অর্জুন মল্লিককে ইংলণ্ডে। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। সেখানেই শিক্ষাপ্রাপ্ত অর্জুন। সেখানেই তিনি শিখে এসেছেন অতি আধুনিক বেতার বিজ্ঞান এবং বায়ুযান বিদ্যা। এই ব্যোমযান তাঁর তৈরি। এ রকম কয়েকটি ব্যোমযান সব সময়েই প্রস্তুত থাকে।

যেমন প্রস্তুত থাকে সুরধনী নদীতে—যার চেহারা এখনও মানচিত্রে পাওয়া যায় না—কঙ্গো—লুয়ালাবার কোন উপশাখারূপেই দু'চারজন যাকে চেনে—সেই সুরধনী নদীতে ছিপ নৌকো বাহিনী। প্রাচীন বাংলার নৌবহরের উত্তরসূরী এরা।

'আপনার কথা শুনে মনে হল আমরা আসছি সেটা আপনি আগেই জানতেন।'

'আমি শুধু নয়। এখানকার প্রশাসনের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ সবাই জানেন।'

'কিন্তু কি—ভাবে?'

'কেন স্থর্থি নোয়াবিন, রুয়াম বর্জি, ক্রাম সুয়ানকে তো দেখেইছেন। এরা সবাই নবগৌড়ের অধিবাসী। আমাদের গুপ্তচর বাহিনীর সেরা লোক। স্থর্থি নোয়াবিন হল আসলে নবীন সারথি। রুয়াম বর্জির নাম রাম ব্যানার্জী, ক্রাম সুয়ানের নামটা সূর্য কর্মকার। আর যাদের দেখেননি অথচ কোণ্ডা থেকে পৌলিস পর্যন্ত যারা আপনাদের অনুসরণ করেছে তাদের মধ্যে আছে পল দেস্যুবে বা সুদেব পাল, জারবি তুয়াত অর্থাৎ বিরাজ দত্ত।'

'কিন্তু এঁরা গভীর জঙ্গলে আমাদের উপর লক্ষ্য রাখলেন কি ভাবে?'

'আমাদের নির্দেশ ছিল যতক্ষণ না আপনারা সিংহ ও হাতিদের কুরুক্ষেত্রে—হ্যাঁ আমরা নাম দিয়েছি ওটার কুরুক্ষেত্রই। মাঝে মাঝেই ওখানে ওদের লড়াই লেগে যায়—। তা ঐ কুরুক্ষেত্রে এসে বিপদে পড়েন ততক্ষণ আপনাদের প্রতিহত না করতে।'

'সেটা বোঝা গেল। এবং আমরা বিপদে পড়েছি জেনেই আপনারা আমাদের উদ্ধার করলেন। কিন্তু ঐ গভীর জঙ্গলে কি ভাবে আমাদের গতিবিধি আপনারা লক্ষ্য করেছেন?'

এতক্ষণে দ্বিতীয় দফায় এসে পৌঁছেছে বাস্থ—কান্থ—বান্থুটি।

বান্থুটির দিকে তাকিয়ে—একটু হেসে বললেন অর্জুন। 'এই যে একে দেখছেন—এও কিন্তু আমাদের লোক।'

বিস্মিত হলেন বাকী সবাই। এতক্ষণে বুঝলেন কেন বান্থুটি শয়তানের নিশির ডাককে উপেক্ষা করেছে। সে তো জানে এটা নবগৌড়ের নৌবাহিনীর শিঙাধ্বনি। তাই সে ভয়ও পায়নি সঙ্গও ছাড়ে নি।

'কিন্তু ও খবর দিল কি ভাবে?'

বান্থুটিই জানাল। কি ভাবে মহারণ্যের চৌডালে বসে থাকে জীবন হাতে করে পিগমিরা। কি ভাবে শিক্ষিত বানরের দ্বারা সংবাদ ছোটে মহারণ্যের গভীর থেকে গভীরে।

'খবরাখবর আদান প্রদান তার মানে সেই ব্রাজাভিল থেকেই চলছে?'

'হ্যাঁ।'

'তা বেতার তরঙ্গে তো ধরা পড়ার কথা অন্য স্বাধীন রাষ্ট্রে।'

'বিশুদ্ধ সংস্কৃত ও বাংলায় মেশানো ভাষা এখনও আফ্রিকায় কেউ বোঝে না।'

সব বুঝলেন ওঁরা।

কিন্তু চমকালেন অর্জুনের শেষ কথায়।

'আমাদের এখানে গত একশ' বছর ধরে কিন্তু চলে আসছে নির্বাচিত গণ-পরিষদের মাধ্যমে প্রশাসন। তার সভাপতি সর্বজন শ্রদ্ধেয় বৈশম্পায়ন সর্বজ্ঞ। রাজা ললিতাদিত্যের সঙ্গে যে বৈদ্যরাজ এসেছিলেন তাঁরই বংশধর।

'এই গণ-পরিষদের পরামর্শ নিয়ে সর্বশেষ রাজাধিরাজ লক্ষ্মণাদিত্য রাজ্য পরিচালনা করতেন।'

'করতেন মানে?'

'তিনি গত পাঁচদিন আগে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তার আগে প্রায় এক বৎসর কাল তিনি দুরারোগ্য কর্কট রোগে ভুগছিলেন। বয়সও হয়েছিল—প্রায় চুরাশি। তাই তাঁকে বাঁচানো গেল না! এবং—

'এবং তিনি অপুত্রক শুধু না নিঃসন্তান ছিলেন। তাই—আনন্দাদিত্যর বংশধরের আগমনের প্রয়োজনটা এই হাজার বছরের মধ্যে এখনই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা—নিয়মানুযায়ী সাতদিন পর্যন্ত প্রয়াত রাজার দেহ রাখা যাবে—তারপর তাঁর বংশধর তাঁর মুখাগ্নি করবেন। তারপর তিনি গণ-পরিষদের দ্বারা আহূত হয়ে সিংহাসনে আরূঢ় হবেন—এই এখানকার প্রথা।'

'কিন্তু আনন্দাদিত্যের বংশধরকে তো সঙ্গে আনতে হবে অর্ধহার এবং তুলোট লিপি!' জয়ন্ত এতক্ষণে প্রশ্ন করল।

'অবশ্যই। এবং হে মহামান্য জয়ন্তাদিত্য—আপনাকে আমি যুবরাজ বলে সম্বোধন করতে পারছি না এই মুহূর্তে, সেজন্য আমি লজ্জিত; কিন্তু নিরুপায়, যেহেতু আমি জানি সেই অমূল্য রত্নহারের অর্ধ এবং তুলোট লিপি এখন মহামান্য রতন আদিত্যের কাছে!'

'রতন আদিত্য!' অস্ফুট স্বরে বলে উঠল এতক্ষণ চুপ করে থাকা ইলোরা।

'হ্যাঁ মাতা ইলোরা। আমরা মহামান্য রতন আদিত্যকেও উদ্ধার

করেছি—তিনি হস্তিপত্তনে আটকা পড়ে গিয়েছিলেন—একই ভাবে সংবাদ পেয়ে আমরা তাঁকে এবং তাঁর অনুচরকে উদ্ধার করেছি।

'গণ-পরিষদে আগামী কাল আমরা উভয় পক্ষকেই উপস্থিত হয়ে বক্তব্য বলার অধিকার দেব।

'সেখানেই বিচার হবে প্রমাণ নিয়ে কে প্রকৃত আদিত্য বংশের উত্তরাধিকারী।'

অর্জুন সবিনয়ে প্রস্থান করলেন।

আহারাদি হল। কিন্তু দুশ্চিন্তায় ঘুম নেই কারোর। প্রমাণ! কি প্রমাণ দেবে জয়ন্ত! জ্যাঠার চিঠি আর ছবি ছাড়া কোন প্রমাণই তো নেই।

'মজাটা দেখেছ!' অনিরুদ্ধ বললেন; 'নিজের পাকড়াশিত্বটা ছেড়ে কি ভাবে রতন আদিত্য হয়ে গেছে।'

'দেখলাম। সেই বুনো হাঁস ধরলেন ঠিকই। কিন্তু ঋণ শোধের সামান্য যেটুকু উপায় আমার ছিল সেটাও আর রইল না। কেবল আমার জন্য এতদিন এই পয়সা ব্যয় আর জীবন মরণ সমস্যা।'

অনিরুদ্ধও আর কিছু বলার মতো পেলেন না। সত্যিই তো যার হাতে রত্নহার আর তুলোট—তাকে ছেড়ে জয়ন্তকে কিসের ভিত্তিতে গণ-পরিষদ মেনে নেবে আদিত্য বংশধর রূপে!'

কেবল শুতে যাবার আগে ইলোরা বলল—'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।'

ষোল

পরের দিন অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙল সবাইএর। নির্দেশ অনুযায়ী স্নান সেরে—জগজ্জনীর দেবালয়ে প্রণাম সেরে—মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত অর্ধমণিহারকে প্রণতি জানিয়ে দুরু দুরু বক্ষে এরা ছ'জন—হ্যাঁ বাম্বুটিও আছে—চলল গণ-পরিষদ কক্ষে।—

বিচার সভা।

বিশাল সিংহাসন শূন্য। তারই ঠিক নীচে আর একটি সুদৃশ্য আসনে যিনি উপবিষ্ট, বলে দিতে হয় না অশীতিপর সৌম্যদর্শন সেই শ্মশ্রুধারি ব্যক্তিই শ্রদ্ধেয় বৈশম্পায়ন সর্বজ্ঞ।

যতখানি বিনীত প্রণতি জানানো যান ঠিক ততটাই বিনয় প্রদর্শন করল জয়ন্ত। অনিরুদ্ধ—ইলোরাও। তাঁদের আসন গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন সর্বজ্ঞ। চারপাশে গণ-পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বসে রয়েছেন। সভার কাজ শুরু হয় নি; কেননা অন্য দাবীদার এখনও এসে পৌঁছোয় নি।

গুঞ্জন ধ্বনি শুনে বোঝা গেল বাইরে জনসাধারণ জমা হয়েছে—এবং তারা দ্বিমত পোষণ করছে। গণ-পরিষদের সদস্যদের উপর চোখ বুলিয়ে অনিরুদ্ধেরও ধারণা হল তাই। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ জয়ন্তদের উপর প্রসন্ন—কেউ কেউ নয়। হতেই পারে—যখন আসল প্রমাণ জয়ন্তের কাছে নেই।

প্রবেশ দ্বারের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই সর্বজ্ঞ পর্যন্ত চমকে উঠলেন। ঢুকছেন আরেক আদিত্য। কিন্তু একি বেশ! পাঁচফুট ছ'ইঞ্চি লম্বা রতনের গায়ে সেই সাড়ে ছ'ফুট রাজপুরুষের লাল কোট। ঢলঢল করছে। পদক্ষেপে দম্ভ। মুখে অবিনীত ভঙ্গি। সঙ্গে অজমাংলু—ভীত সন্ত্রস্ত।

রতন ঢুকেই প্রায় সদম্ভেই সর্বজ্ঞের সামনে উপস্থিত হল। এরকম বিনা অভিবাদনে সর্বজ্ঞের সামনে স্বয়ং রাজাও কোনদিন উপস্থিত হতেন না। গণ-পরিষদের সদস্যদের চোখে মুখে অসন্তোষ ফুটে উঠল পরিষ্কার ভাবে। কিন্তু এই ব্যক্তিটি যে প্রমাণ উপস্থিত করছে ঐ বাক্সটি থেকে সেটি দেখে এঁরা চুপ করেই গেলেন।

সকলের উপাস্য সেই মণিহারের অর্ধাংশ—এবং তুলোট লিপি।

সর্বজ্ঞ পর্যন্ত উঠে দাঁড়িয়ে প্রণতি জানালেন অর্ধহারকে। গণ-পরিষদের সদস্যরা তো বটেই। অবশ্যই জয়ন্তরাও।

আসন গ্রহণ করল রতন। মাংলু দণ্ডায়মান—যেমন কান্থ—
—বাস্থ—বান্থুটি।

সর্বজ্ঞ প্রথমেই আহ্বান করলেন রতনকে তার বক্তব্য পেশ করার জন্য।

রতন যা বলল—তার মর্মার্থ এই যে—আদিত্য বংশের সেই-ই বর্তমান পুরুষ। আজীবন কাল সে শুনে এসেছে পিতৃ পিতামহের আমল থেকে এই মণিহারের কথা। কিন্তু সঙ্গীহীন অবস্থায় সে আসে কি করে! কালক্রমে অনিরুদ্ধ জয়ন্তের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তাঁরা তাঁকে সাহায্য করতে রাজী হয়েছিলেন—শর্ত ছিল এখানে এসে পৌঁছোতে পারলে রতন ওঁদের যথাবিধি পুরস্কৃত করবে।

অনিরুদ্ধের অনেক জানা চেনা। তিনিই পাসপোর্ট থেকে সব কিছুর ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর বুদ্ধিতেই রতনকে পাসপোর্ট করাতে হয়েছে পাকড়াশি বলে, কেননা অনিরুদ্ধ বলেছিলেন সত্যিকারের আদিত্য বংশের লোক সে—এই পরিচয় পেয়ে গেলে তার বিপদ হতে পারে কোন অজানা শত্রুর হাতে—কারণ যেখানে তাঁরা যাচ্ছেন সে দেশের পরিস্থিতি তো তাঁদের জানা নেই! তাই রতন সরল মনেই এই ঐতিহাসিকের কথা বিশ্বাস করেছে। কিন্তু স্বপ্নেও সে ভাবেনি যে অনিরুদ্ধ জয়ন্তকেই আদিত্য বংশধর সাজিয়ে এই রকমের একটা নোংরা ষড়যন্ত্র করেছেন।

ধরা গলায় কথাগুলো বলে রতন তারপর জানাল কি ভাবে সে টের পায় যে জয়ন্তরা তাকে নির্মমভাবে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে—তাই কেবল ঐ মাংলুকে সম্বল করে সে পালায়—ঐ অভিজ্ঞানটি নিয়ে। তারপর নবগৌড়ের হস্তি বাহিনী কি ভাবে তাকে ও মাংলুকে উদ্ধার করেছে সেটা নিশ্চয় পরিষদের জানা। অভিজ্ঞান সে এনেছে—সামনেই রয়েছে ঐ মণিহার-অর্ধ। তুলোট

লিপি নির্দেশও সে এনেছে—এখন প্রয়াত রাজা লক্ষ্মণাদিত্যের মুখাগ্নি করার জন্য সে ব্যগ্র!

দুর্ভেদ্য বক্তব্য।

জয়ন্তকে তার কথা বলতে বললেন সর্বজ্ঞ। বিস্তৃত বিবরণ দিল জয়ন্ত। অনিরুদ্ধের সঙ্গে পরিচয় থেকে অনন্তের শ্রাদ্ধ—সমুদ্র যাত্রা—রতনের ধূর্তামি—চৌর্যবৃত্তি—কিছুই বাদ রাখল না সে। আর দেখাল জ্যাঠার চিঠি ও ছবি। সর্বজ্ঞের কাছে সে দু'টোও জমা পড়ল।

অনিরুদ্ধ বলে গেলেন তাঁর সমগ্র ইতিহাস। সর্বজ্ঞ পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে শুনে গেলেন এই ঐতিহাসিক পর্যটকের বৃত্তান্ত।

ইলোরাকে যখন আহ্বান করলেন সর্বজ্ঞ—সে সবিনয়ে জানাল তার বক্তব্য সে সর্বশেষে জানাতে পারলে বাধিতা হবে। হয়তো নারী বলেই—তার অনুরোধ উপেক্ষা করলেন না সর্বজ্ঞ।

বাসু বলল, কানু বলল তাদের সমগ্র ইতিহাস, রতনের পলায়ন এবং সমগ্র যাত্রাপথে রতনের কার্যকলাপ।

মজা হল অজমাংলুর বেলায়। সে যা বলল—তার সারাংশ এই যে হয়তো রতনই রাজা—কেননা ঐ অলঙ্কারটা ওঁর সঙ্গে দেখেই মাংলু ওঁকে দেবতা বলে মেনে নিয়েছিল। তবে রতনকে হত্যার ষড়যন্ত্র জয়ন্তরা করেছিল কিনা তার জানা নেই। কিন্তু রতন কিভাবে সবাইকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে পালিয়েছিল সেটা সে বলল। আর তার সঙ্গে যোগ করল কি ভাবে হাতির পালের মধ্যে পড়ার সময় রাজা তাঁকে ফেলে অন্যত্র গিয়েছিলেন। পরিবেশ মাংলুকে দিয়ে সত্য কথাই বলিয়ে নিল।

বাসুটি বলে গেল তার যাত্রা পথের কাহিনী। রতনের পলায়ন এবং তার সংবাদ প্রেরণের ঘটনা।

গণ-পরিষদ বুঝতে পারছেন—কোথাও একটা গণ্ডগোল আছে! রতনের হাবভাব সবই অরাজোচিত, অন্যদিকে জয়ন্তের মধ্যে রয়েছে সত্যের আভাস। কিন্তু ললিতাদিত্যের নির্দেশ—। তাতো রতনের

পক্ষেই যায়। জয়ন্তরা যা বলছে সবই তো মুখের কথা। রতন যে প্রমাণ দিচ্ছে। ঐ তো জ্বলজ্বল করছে অর্ধমণিহার—যা কিনা দু'দিন বাদেই বাকী অর্ধেকের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গৌড়ভুজঙ্গের পূর্ণ কণ্ঠহারে পরিণত হবে।

সবাইএর কথা শেষ হল। এইবার আবার তাকালেন সর্বজ্ঞ ইলোরার দিকে। সম্বোধনে স্নেহ। 'হে মাতঃ তুমি কিছু বলবে তো?'

ইলোরা উঠে দাঁড়াল। প্রণতি জানাল সর্বজ্ঞকে। 'পরম শ্রদ্ধেয় সভাসদজন' বলে সম্বোধন করে ইলোরা বলল, 'আমি মুখে কিছু বলব না। আমার বক্তব্য বলবে আমার হাতের এই যন্ত্রটি। তার আগে যদি দয়া করে আপনারা আমাকে একটু সময় দেন সামান্য আয়োজনের।'

অনুমতি মিলল। ইলোরার অনুরোধে দেওয়ালে টানানো হল একটি সাদা পর্দা—যা ওর সঙ্গেই ছিল। যতটা সম্ভব ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরটাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করা হল।

'আমার বক্তব্য পর্দায় দেখুন' বলে ইলোরা তার ক্যামেরা ও প্রজেকটর চালু করল। পর্দায় ফুটে উঠতে থাকল চলচ্চিত্র। অনন্তের বাড়ি। ঘর। ফতুয়া। চিঠি। বাক্স—তোরঙ্গ—ছবি। চুপড়ি। চুপড়ি থেকে বেরোল লাল কোট। জয়ন্ত সর্বত্র। ছবি চলে এল অনিরুদ্ধের ঘরে। বেরোল রত্নহার। বেরোল তুলোট চিঠি। ছবি এবার ছত্রপতি শিবাজী জাহাজে। জয়ন্তদের কেবিন। জয়ন্তরা দরজা বন্ধ করল। ছবিতে বন্ধ দরজার ভিতর দিক। বন্ধ দরজা খুলছে। চোরের মতো প্রবেশ করছে রতন। তন্ন তন্ন করে খুঁজে চলেছে সব। এ্যাটাচিকেস ভাঙা হল। রতন বার করে আনল রত্নহার ও তুলোট। জয়ন্তদের কাছে ধরা পড়া। বিনীত ভঙ্গিতে ফিরিয়ে দেওয়া রত্নহার—একের পর এক ছবির ধারা।

এক সময়ে জঙ্গলে এসে ছবি শেষ হল।

ধিক্কার ধ্বনি উঠে এল গণ-পরিষদের সদস্যদের মুখে। ঘরের দরজা জানালা খুলে দেওয়া হল। সর্বজ্ঞের মুখে হাসি। জয়ধ্বনি উঠে এল গণ-পরিষদের সদস্যদের মুখে।

সর্বজ্ঞ কেবল বললেন—'জয়তু রাজা জয়ন্ত আদিত্য। আপনিই যথার্থ আদিত্য বংশধর। জয়তু।'

কিন্তু বাইরে কিসের কোলাহল। একদিকে জয়ন্তের নামে জয় ধ্বনি—আরেক দিকে ও কিসের কোলাহল।

সকলের নজর গেল রতনের আসনের দিকে। নেই, পালিয়েছে। কিন্তু পালাতে পারেনি। বাইরে জনতা তাকে ধরে ফেলেছে।

না। রতনের কোন শাস্তি হয়নি। রাজা জয়ন্ত আদিত্যের অনুরোধে রতনকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে নবগৌড়ে শান্তিতে বাস করার।

মুখাগ্নি হল রাজা লক্ষ্মণাদিত্যের। রত্নহার স্থান পেল মন্দিরে। অর্ধহার পূর্ণ হল।

সব অনুসন্ধান শেষ হলে—ইলোরা কেবল বলল, 'তোমাদের কেবিনে কিটব্যাগে ক্যামেরাটা কেমন কায়দা করে বসিয়েছিলাম বল?'

'কিন্তু কেন বসিয়েছিলে? তুমি তো আর জানতে না যে রতন পাকড়াশি ঐভাবে কেবিনে ঢুকে পড়বে?'

'সব দিকে চোখ-কান খোলা রাখতে হয় মশাই। এ রকম একটা অভিযানে কখন কোন দিকে বিপদ আসে তার ঠিক কি? তাই আমার দিক দিয়ে যাতে কোন ত্রুটি না থাকে তার ব্যবস্থা আমি করেছিলাম। এটা সত্যিই, রতন পাকড়াশির কথা আমি ভাবিও নি। কিন্তু ঐভাবে গোপনে মালপত্র তোলা হল জাহাজে—ভেবেছিলাম যদিই কারোর নজরে পড়ে যায়—সে ভাববে কোন অমূল্য বা বেআইনী জিনিস আমরা নিয়ে চলেছি; গোপনে সে অনুসন্ধান করতে

পারে। তাছাড়া অন্য কারোর সন্দেহ হোক বা না হোক, কানু-বাসু তো তখন আমাদের এতো আপনজন ছিল না। ওরা গোপনে অত সাহায্য করল—ওদের মনে কোন অভিসন্ধি তো থাকতেই পারে—তখন এটাও ভেবেছিলাম। তাই যদি কানু-বাসু বা অন্য কেউ লোভে পড়ে আমাদের অনুপস্থিতিতে কেবিনে প্রবেশ করে, মূল্যবান কোন কিছুর আশায়—তবে সেই ব্যক্তিটির চেহারাটা যাতে ছবিতে ধরে রাখা যায়, এই ভেবেই ব্যবস্থাটা করেছিলাম; প্রয়োজনে তাকে সনাক্ত করার জন্য। তা পড়বি তো পড় একেবারে আসল খল নায়ক রতন পাকড়াশিই ধরা পড়ে গেল। তখন তো সত্যিই ভাবিনি যে শেষপর্যন্ত এই মেয়েটাকেই উদ্ধারকর্ত্রী হতে হবে যুবরাজ আদিত্যের !'

বিস্মিত ভাবে উত্তরটা শুনছিল জয়ন্ত।

'তুমি ছাড়া আর কেই বা উদ্ধার করবে আমায়? আদিত্য বংশে তুমি হচ্ছ গৌড়ভুজঙ্গিনী !' মুগ্ধ জয়ন্তের মুখ থেকে জবাবটা এল।

॥ শেষ ॥
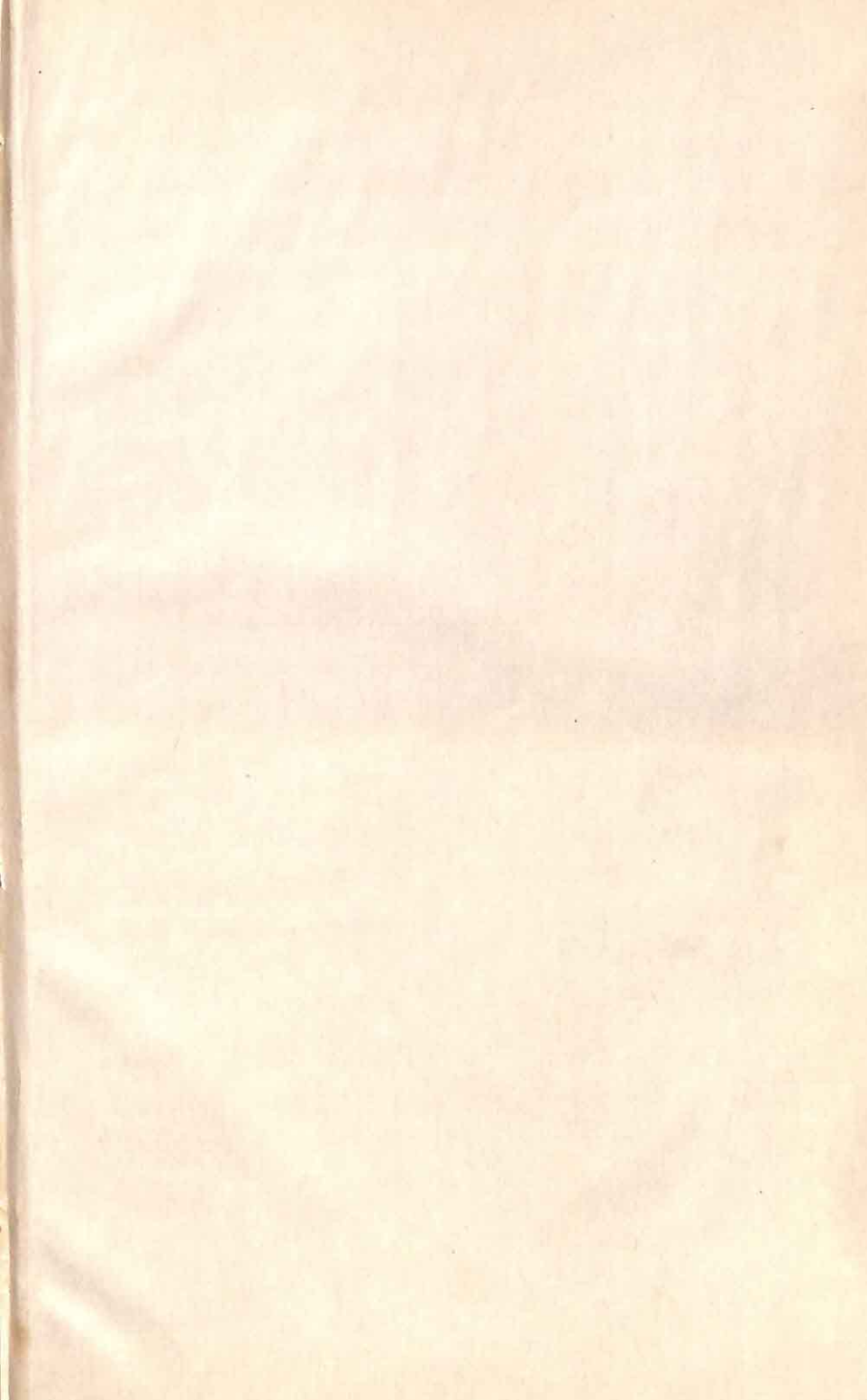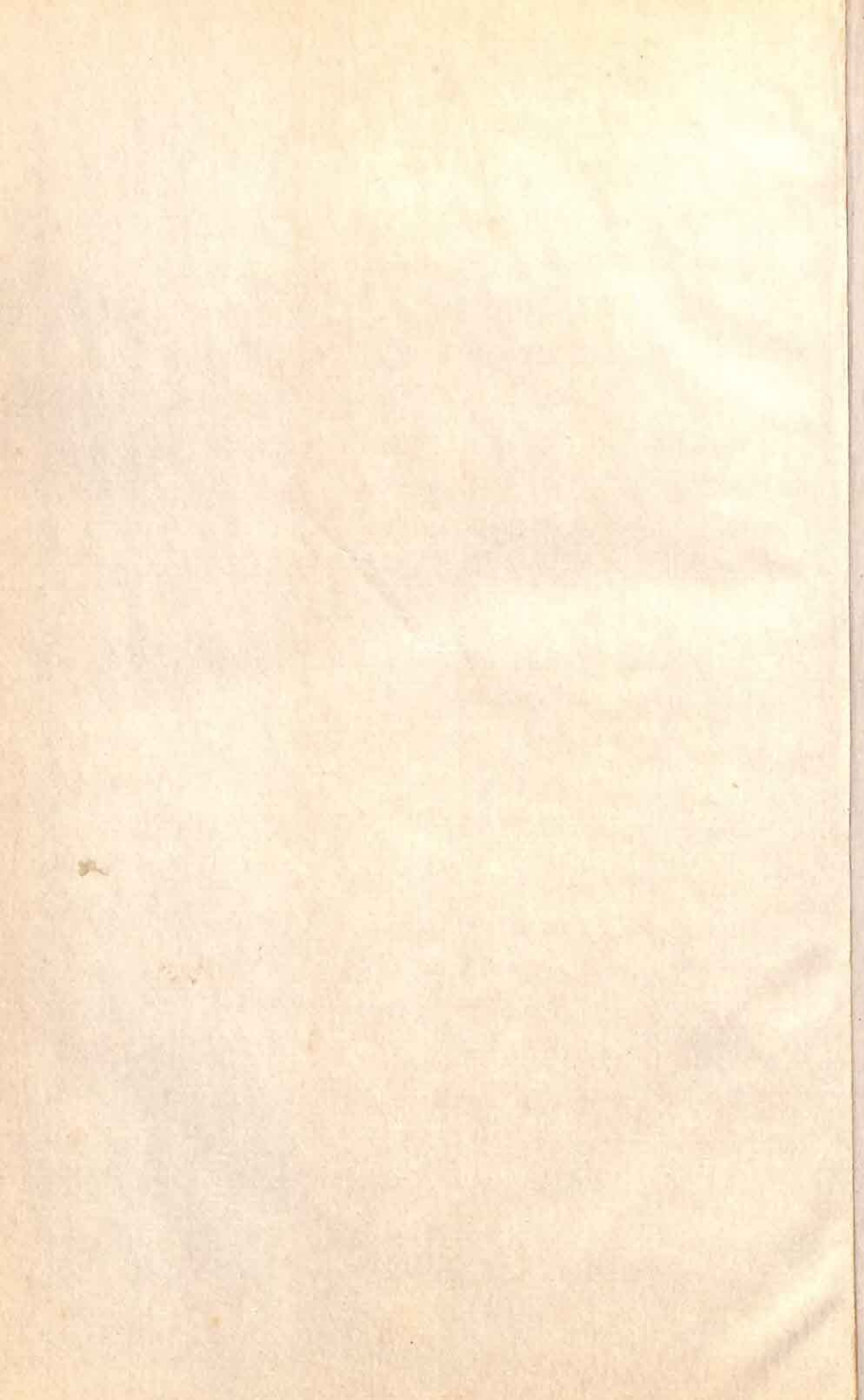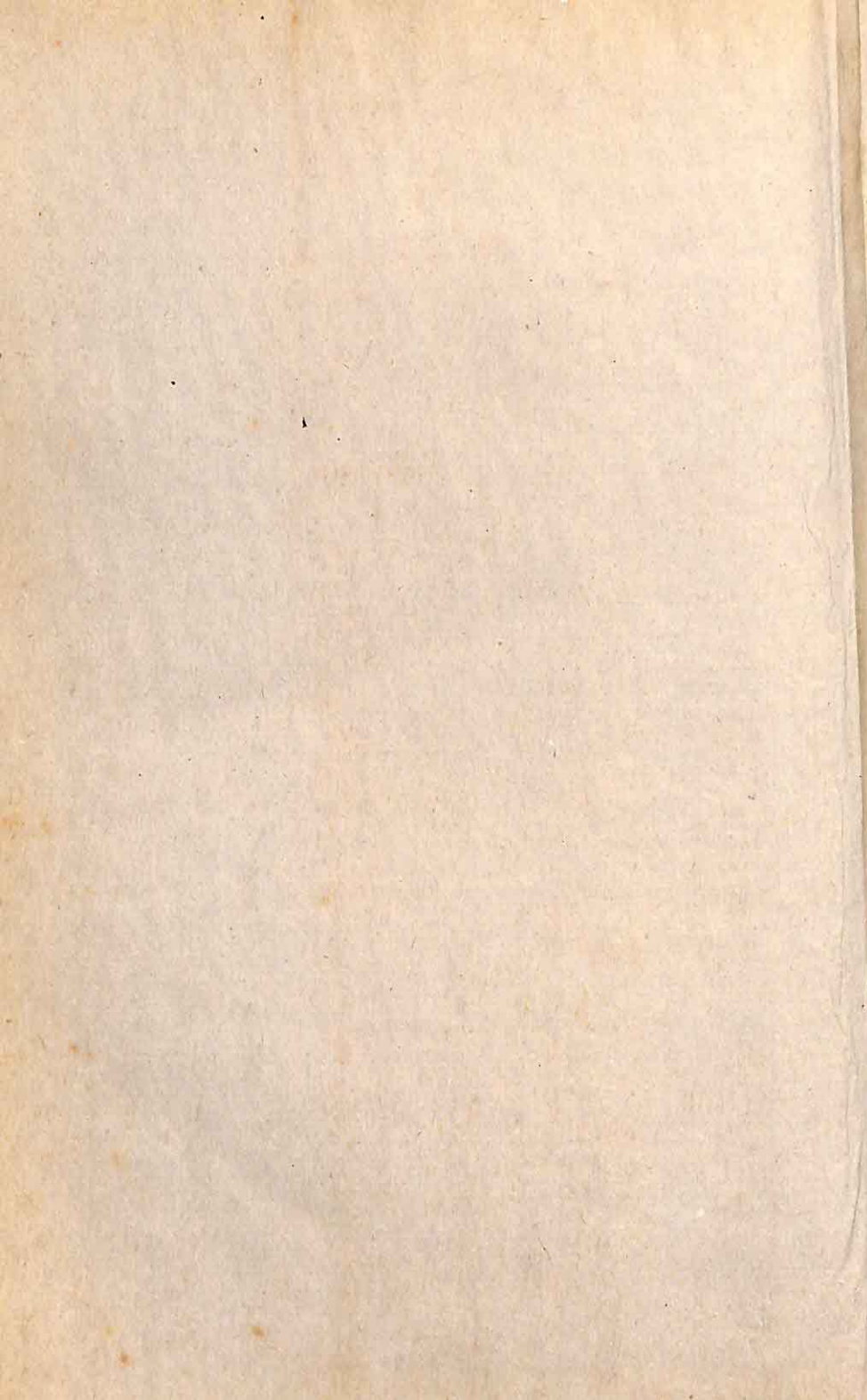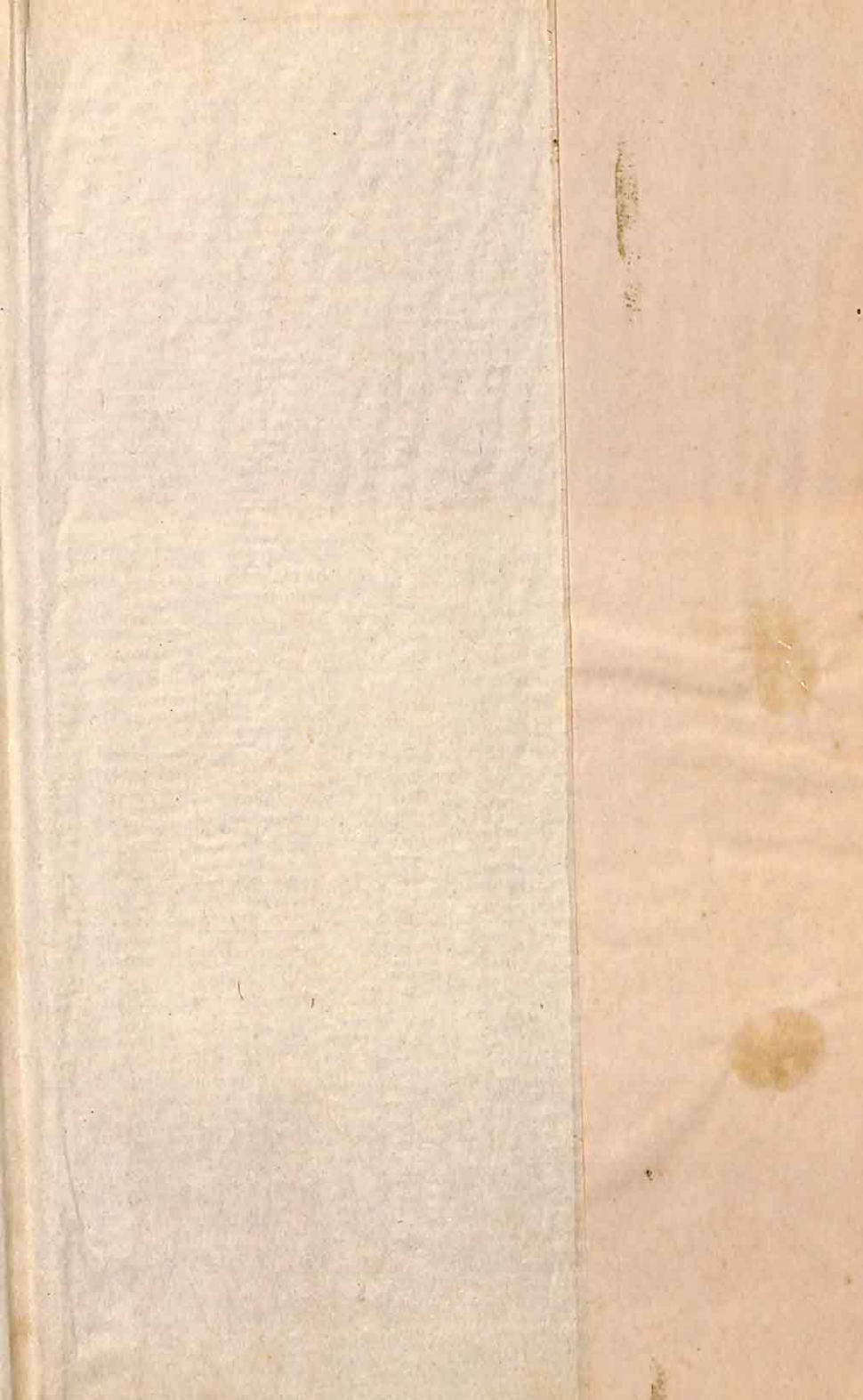
সাড়ে তেরশ' বছর আগে গৌড়ে রাজত্ব করে গেছেন শশাঙ্ক নরেন্দ্রাদিত্য। তারপর সেই বংশধারা কি লুপ্ত ?

ডঃ অনিরুদ্ধ বোস শুধু ইতিহাস নিয়েই গবেষণা করেন নি, তুর্গম আফ্রিকার জঙ্গলেও গিয়েছিলেন—কেন ? কেন তিনি ফিরে এলেন নিজের বাসভূমি নবনগরে ?

আঠাশ বছরের যুবক, সাড়ে চারশ' টাকা মাইনের এক অতি সাধারণ ছেলে, কিন্তু চেহারায় ফুটে বেরোয় আভিজাত্য—জয়ন্তাদিত্য রায়—তার উপর এত রাগ কেন ও. সি রতন পাকড়াশির ?

জয়ন্ত অনিরুদ্ধের অনুরোধে চাকরি ছাড়ল কেন ? অনিরুদ্ধ বোসের মেয়ে ইলোরা সবসময়ে মুভি ক্যামেরা নিয়ে ঘোরে কেন ?

গৌড়ভুজঙ্গ কে ? কণ্ঠহারই বা কি ? শয়তানের নিশির ডাক কি ? আরজুয়ান মালেক কে ?

পংক্তিতে পংক্তিতে রহস্য, এ্যাডভেঞ্চার—সব বয়সের পাঠক-পাঠিকাদের রুদ্ধশ্বাসে পড়বার মতো বই 'গৌড়ভুজঙ্গ কণ্ঠহার।'